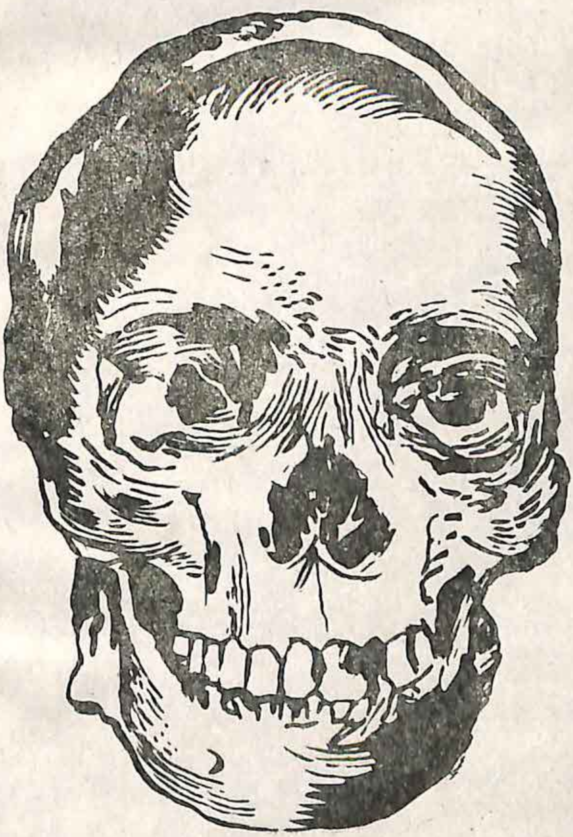
জীবন্ত কঙ্কাল

সুনির্মল বসু



জীবন্ত কঙ্কাল



জীবন্ত কঙ্কাল

সুনির্মল বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রক :
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১৫ টাকা
Rupees Fifteen only



ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ; বেলা শেষের স্তিমিত তরল আলোর ধারাটুকু ঐ বিপুল অন্ধকার-দানব যেন এখুনি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।

দূরে— অতি দূরে, অনন্ত অনুর্বর খাজুড়ি প্রান্তরের প্রান্তে— দিগন্ত সীমায়— নীলাভ পর্বতশ্রেণীর মাথায় তখনো বেলাশেষের রঙীন রোদটুকু ঝিলমিল করছে।

প্রণব আর প্রশান্ত একটি জীর্ণ বাড়ির দ্বারে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। আজ রাত্রে এখানেই তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রণব, প্রশান্ত, প্রভাত, প্রফুল্ল। আজ মাস ছয় আগে এই চার বন্ধু শরতের এক স্নিগ্ধ-প্রাতে শ্যামল মাতৃভূমি বাংলাদেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে— হয়তো চির-বিদায় নিয়েই— সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিল। কারণ আবার তারা নিরাপদে যে দেশের বুকে ফিরে আসবে— এ ভরসা তাদের কারুরই ছিল না। তারা জানত, এই ভ্রমণের দায়িত্ব কতখানি, এই দুঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তবু তাদের মন মেতে উঠেছিল দূরের ডাকে— অসীমের আহ্বানে। একটা অপূর্ব উত্তেজনায়,— একটা অদম্য

উদ্দীপনায় তারা ক্ষেপে উঠেছিল। ভ্রমণের নেশা তাদের মরণের ভয়কেও জয় করেছিল।

ঠিক হয়েছিল, প্রণব ও প্রশান্ত যাবে ভারতের পশ্চিমের পথ ধরে— খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে, প্রভাত আর প্রফুল্ল তাদের অভিযান শুরু করবে ভারতের পূর্বদিকের পথে— বর্মার ভিতর দিয়ে।

এই রকমভাবে পৃথিবীর দুই প্রান্ত তারা দুইভাগে সাইকেলে ভ্রমণ ক'রে জগতে একটা অপূর্ব কীর্তির জয়ধ্বজা ওড়াবে।

ঘটনার স্রোতের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে প্রণব আর প্রশান্ত আজ সকালবেলা পেশোয়ার সীমান্ত পেরিয়ে খাইবার পথ ধরেছে।

সারাদিন তারা দুর্দান্ত পরিশ্রমে বিখ্যাত খাজুড়ির মাঠের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। পেশোয়ার শহর পার হয়েই এই খাজুড়ির মাঠ— সীমাহীন অনুর্বর মরুভূমি বিশেষ।

এই মাঠের মধ্য দিয়ে আছে একটি সংকীর্ণ পথ— শুধু এই পথটি ছাড়া আর কিছুই ভারত সরকারের অধীনে নয়। পথিক নিজের দায়িত্বে এখানে পথ চলে। বন্দুকধারী দুরন্ত আফ্রীদিদের দল এই মাঠে বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা অশিক্ষিত, অসভ্য ও নিষ্ঠুর। যে কোনো মুহূর্তে তারা নিরীহ পথিকদের আক্রমণ করে সর্বস্ব লুটপাট করে নেয়,— অনায়াসে যাত্রীদের হত্যা করে। বিন্দুমাত্র তাতে তারা বিচলিত হয় না।

পথ চলতে চলতে প্রণব আর প্রশান্তের সঙ্গে দু'চারজন বন্দুকধারী আফ্রীদির দেখা হয়েছিল— কিন্তু সৌভাগ্যবশত এখন পর্যন্ত কোনো বিপদে তাদের পড়তে হয় নি।

দুই

লাণ্ডিখানা হচ্ছে ভারতের শেষ সীমা, তার পরেই আফগান রাজ্য শুরু হয়েছে। পেশোয়ার আর লাণ্ডিখানার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি দুর্গ আছে— নাম তার সাগাই।

প্রণব আর প্রশান্ত ভেবেছিল সন্ধ্যার আগেই তারা সাগাই দুর্গে পৌঁছে যাবে, আর রাত্রিটা সেখানেই কাটাতে পারবে পরম নিশ্চিতে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা পথ ধরতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ ভুল রাস্তায় এসে পড়েছে।

এখন আবার উল্টো পথে ফিরে গিয়ে বড় রাস্তা ধরা সম্ভবপর নয়।

প্রণব সাইকেলের গতি মন্থর করে প্রশান্তকে বললে— ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে সামনেই একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে, না হলে এই জনবিরল মাঠের মধ্যে মহা বিপদেই পড়তে হোতো দেখছি। সামনের ঐ বাড়িটাতেই চলো রাতের মতো আশ্রয় নেওয়া যাক। বোধহয় সরাইখানা ওটা।

প্রশান্ত ততক্ষণ সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। প্রণবের কথা সমর্থন করে সে বললে— আমার মনে হয় বাড়িখানা কোনো আফ্রীদির। হয়তো কাছেই আফ্রীদিদের গ্রাম আছে। যত বড় নিষ্ঠুরই তারা হোক না— আমাদের বিপদ জানতে পারলে বোধ হয় ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। হাজার হোক ওরাও তো মানুষ।

প্রণব উত্তর দিলে— যদি আমাদের সঙ্গে ওরা একান্ত অভদ্র ব্যবহারই করে— তা হলেও কোনো ক্ষতি করবার সাহস হয়তো ওদের হবে না। আমাদের সঙ্গে যে দু'টো উৎকৃষ্ট রাইফেল বন্দুক আছে— সে দুটো নিশ্চয়ই ওদের নজরে পড়বে।

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু এসে সেই বাড়িটার সামনে উপস্থিত।

কাঁকর মিশানো মাটির তৈরি একখানি জীর্ণ বাড়ি, তার চেয়েও জীর্ণ

এক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় চাপড়া ধ্বসে পড়েছে— অত্যন্ত শ্রীহীন।

প্রশান্ত বললে— মনে হচ্ছে কোনো দরিদ্র আফ্রীদি পরিবারের বাড়ি এটা। যা হোক, এসো একবার খোঁজ করা যাক। সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সকলের আগে এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুতে না পারলে আর যেন কিছুতেই চলছে না।

বাড়ির লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে প্রণব খুব জোরে জোরে তার সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে লাগল— প্রশান্তও যোগ দিল সেই সঙ্গে।

কিন্তু কই,— কারুরই তো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না! তবে কি সবই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এখনো তো সন্ধ্যাই ভালো করে নামে নি,— এর মধ্যেই যে বাড়িখানিতে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

প্রশান্ত তার সাইকেলখানা মাটিতে শুইয়ে রেখে আস্তে আস্তে এসে বন্ধ দরজায় আঘাত করলো। ধীরে একটু ঠেলা মারতেই দরজার একটা পাট খুলে গেল।

প্রশান্ত হিন্দি ভাষায় বলে উঠল— ভিতরে কে? আমরা একটু আশ্রয় চাই— আমরা, পথভ্রষ্ট, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন পথিক।

বাইরের পৃথিবীতে তখনো আবছা আলো বর্তমান ছিল বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভিতরে আর নজর চলে না।

প্রশান্তর গলার স্বরটা সেই অন্ধকার ঘরে গমগম করে ফিরতে লাগল, দ্বিতীয় কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

প্রশান্ত প্রণবকে বললে— প্রণব, টর্চটা নিয়ে এদিকে এসো, ভিতরে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় কোনো পোড়ো বাড়িতে এসে পড়েছি আমরা। না হলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যেত।

প্রণব ততক্ষণে টর্চ নিয়ে হাজির। তার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে প্রশান্ত খুট করে বাতিটা জ্বেলে ফেললে, তারপর অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে চমকে উঠল।

তিন

অন্ধকার ঘরের মধ্যে টর্চের তীব্র আলো পড়তেই সবার প্রথমে যে দৃশ্যটা প্রশান্তর চোখে পড়ল— তাতে সে শিউরে কেঁপে উঠল— তার সমস্ত মাথাটা ঘুরে উঠল বনবন করে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে সে প্রণবকে বললে প্রণব শেষ কালে কি আমরা খুনের দায়ে পড়বো নাকি, এই ছাখো ঘরের মেঝের উপর কী পড়ে আছে।

প্রণব বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে ঘরের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি ল্যোক, তার সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত। চারিপাশে যেন রক্তের বন্যা বয়ে গেছে।

প্রণব ঘরের ভিতর ঢুকে ভালো করে লোকটাকে পরীক্ষা করে বললে মনে হচ্ছে, অল্পক্ষণ হল লোকটাকে কেউ গুলি করে হত্যা করেছে।

প্রশান্ত এই দৃশ্য দেখে প্রথমটা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এইবার সে ভাবটা কিছু সামলে নিয়ে বললে— কী করে বুঝলে প্রণব, লোকটা অল্লক্ষণ হল মরেছে—

দেখছো না, লোকটার শরীর থেকে এখনো তাজা রক্ত ঝড়ে পড়ছে,— এই ছাখো পিঠের কাছে কাঁধের নীচে জখমের চিহ্ন,— এটা গুলির দাগ ছাড়া কিছুই নয়। প্রণব উত্তর দিল।

প্রশান্ত বললে এ যে বড় রহস্যময় ব্যাপার। এই নির্জন কুঠিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটল কি করে? কেই বা এই হত্যাকারী, আর নিহত ব্যক্তিই বা কে? আমি যে কিছুই ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না প্রণব।

আমার এখন ভয় হচ্ছে,— আমরা আবার অনর্থক খুনের দায়ে না পড়ি। চলো, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়া যাক।

প্রণব উত্তর দিল— আমরা এখন যে স্থানে এসে পড়েছি— সেখানে আইন কানুন নেই, কোনো শৃঙ্খলা বিধান নেই, কোনো বিচার-ব্যবস্থা নেই, এ দুর্দান্ত আফ্রীদিদের স্বাধীন এলাকা। এখানে খুনের দায় বলে কিছু নেই, অবলীলাক্রমে এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটে, অনায়াসে এখানে লুটতরাজ চলে। কাজেই সাবধান— যে কোনো মুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। বিশেষত যখন এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে,— তখন নিশ্চয়ই এর ভিতর কোনো রহস্য লুকানো আছে। আমার মনে হয় এই হত্যার তদন্ত করতে নিশ্চয় শীগ্‌গিরই আরো লোকজন এখানে এসে হাজির হবেই।

টর্চের আলোতে দুই বন্ধু ঘরের ভিতরটা ভালো করে দেখতে লাগল।

অপরিচ্ছন্ন ঘর। চারিধারে হাঁড়ি-কুঁড়ি ছড়ানো। একদিকে একটা কাঠের তক্তা পাতা, বোধ হয় এটা বিছানা। পাশে আর একটা কুঠুরি তাতে কুলুপ-আঁটা। তার ভিতরে যে কী আছে তা জানা গেল না।

হঠাৎ প্রণব বলে উঠল— যা ভেবেছি তাই,— নিশ্চয় এই ঘরে দু'জন লোক বাস করে। একজন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছে— আর একজন পালিয়েছে। বোধ হয় সে এই হত্যার খবর তাদের দলের লোকদের দিতে গেছে।

বুঝলে কি করে প্রণব? আশ্চর্য হয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে— আমি তো এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণব ঘরের কোণায় আঙুল দেখিয়ে বললে ঐ ছ্যাখো দুটি থালায় খাবার সাজানো রয়েছে, রুটি আর তরকারী। আমার মনে হচ্ছে, লোক দুটি খেতে বসবে এমন সময় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

প্রশান্ত উত্তর দিল— কিন্তু এওতো হতে পারে প্রণব যে, লোক দুটির পরস্পরের মধ্যে কোনো কারণে ঝগড়া বেধে যায় আর তাতেই

অপর লোকটা এই ব্যক্তিকে খতম করেছে।

বাস্তবিক এওতো সম্ভবপর হতে পারে। এ বিষয়টা প্রণব এতক্ষণ ভেবে দেখে নি।

প্রণব বললে যা হোক ভাই, ও লোকটা তো সত্যিই মরেছে— ওর জন্যে আর আমরা ভেবে মরতে পারি না। শরীরের যা অবস্থা আর এক পাও নড়বার ক্ষমতা নেই। আজ রাতটা যে করেই হোক এই মড়া আগলেই আমাদের পড়ে থাকতে হবে।

প্রশান্তরও আর পথ চলবার ক্ষমতা নেই। তার শরীর আর মন দুই-ই চাচ্ছে বিশ্রাম— সে এখন একটু আরামের কাঙাল। কিন্তু এই অজানা জায়গায় এই রকম একটা দুর্জ্ঞেয় রোমাঞ্চকর অবস্থার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকতে তার অন্তরাত্মা যেন মধ্যে মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবু আর উপায় নেই। এই অন্ধকার রাত্রে, এই অজ্ঞাত দেশে— পথভ্রান্ত পথিক তারা— কোথায় যাবে? কে তাদের আশ্রয় দেবে।

প্রশান্তর শরীরে শক্তি যথেষ্ট কিন্তু প্রণবের মনের বল অতি অসাধারণ; সাধারণত বাঙালি যুবকের মধ্যে এতটা মনের তেজ— এতটা দুর্জয় সাহস বাস্তবিকই দুর্লভ। প্রশান্ত যখন কোনো আসন্ন আশঙ্কায় ভীত, বিচলিত হয়ে ওঠে, তখন তাকে উদ্দীপিত করে প্রণবের অদম্য উৎসাহ।

প্রণব বললে, প্রশান্ত, আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। ক্ষিধের চোটে নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার যোগাড়। এসো প্রশান্ত এক কাজ করা যাক। সঙ্গে যা খাবার আছে— তা এখন আর নষ্ট করে দরকার নেই। ঐ যে দুটি থালায় আমাদের খাবার সাজানো আছে। কথায় বলে বাড়া ভাত পায়ে ঠেলতে নেই। এসো ওগুলির সদ্ব্যবহার করা যাক। আজ রাতটা ওতেই আমাদের দিব্যি চলে যাবে। কি বল!

এই বলে প্রণব আর বাক্যব্যয় না করে সেই থালায় সাজানো রুটি আর তরকারী পেটুকের মতো খেতে আরম্ভ করে দিল।

প্রশান্তরও ক্ষিধের চোটে পেট চোঁ-চোঁ করছিল। সেও তাড়াতাড়ি এসে প্রণবের সঙ্গে যোগ দিল।

খেতে খেতে প্রণব উৎসাহের সঙ্গে বললে— বাঃ, তোফা রান্না। তরকারীর স্বাদ কী চমৎকার।

প্রশান্ত বললে, পেশোয়ারের এক হোটেলে আমরা এই রকম তরকারী কাল খেয়েছিলাম।

চার

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি।

শীতের শেষ, অল্প অল্প দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করেছে— কিন্তু এখনো আকাশভরা পাতলা কুয়াশার স্তর।

সবে মাত্র চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়ে, কিন্তু এই কুয়াশার আবরণ ঠেলে ভালো করে সে আর আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। মূর্তি তার বড় নিষ্প্রভ, হাসি তার বড় ম্লান।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রণব আর প্রশান্ত জেগেই ছিল। গল্প করেই তারা আজ রাতটা কাটিয়ে দেবে এই ছিল মতলব। কিন্তু কোন্ অজান্তে তাদের চোখে যে ঘুম নেমে এসেছে— তা বুঝতে পারে নি।

হাতের কাছে টোটা-ভরা দুটো রাইফেল— কি জানি কোন্ মুহূর্তে, কোন্ অজানিত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। ভালোয় ভালোয় লাণ্ডিখানায় পৌঁছতে পারলে তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

প্রণব পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে, হঠাৎ প্রশান্তর এক ঠেলা খেয়ে সে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। কি ব্যাপার প্রশান্ত?

রাইফেলটা তাড়াতাড়ি তুলে ধরো— প্রণব বললে।

ঐ শোনো প্রণব— রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশান্ত উত্তর দিল।

দূরে— অতি দূরে— মনে হল যেন কতগুলি লোকের ক্ষীণ কোলাহল শোনা যাচ্ছে— আর সেই সঙ্গে ভেসে আসছে কুকুরের চিৎকার।

প্রণব স্থির হয়ে সেই শব্দ শুনল, তারপর বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে— বোধ হচ্ছে লোকগুলি এই দিকেই আসছে, ঐ শোনো তাদের গলার

আওয়াজ ক্রমে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তবে আর এক মুহূর্তের জন্যেও এখানে থেকে কাজ নেই প্রণব। এসো আমরা পালাই। ঐ দুর্দান্ত দস্যুগুলির খপ্পরে পড়লে আর বিন্দু-মাত্র জীবনের আশা-ভরসা থাকবে না। যদিও আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে, তবুও ওদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই এঁটে উঠব না— ঐ শোনো কুকুরের আর্ত চিৎকার এখন খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় ওরা এসে পড়ল বলে।

ঠিকই বলেছ, প্রশান্ত, আমাদের অনুমান ঠিক, লোকগুলি এদিকেই আসছে কোলাহল করতে করতে···

এই বলে প্রণব বাইরে এসে অন্তহীন ফাঁকা মাঠটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলো। তারপর চাপা গলায় বলে উঠল, ঐ ছাখো প্রশান্ত, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে কতকগুলি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মশালধারী লোকগুলি ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। আর বিন্দুমাত্র দেরি করলে হয়তো···

প্রণবের কথা শেষ হতে না হতে প্রশান্ত লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল— এসে পড়েছে,— এসে পড়েছে,— এই ছাখো তোমার পায়ের কাছে কি—

প্রণব সভয়ে তাকিয়ে দেখল তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের কুকুর জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

সাইকেল দুটো প্রস্তুতই ছিল।

প্রণব আর প্রশান্ত দুই লাফে সাইকেলে উঠে বসে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে দিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে।

যে দিক দিয়ে লোকগুলি আসছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের প্রান্তর দিয়ে তারা প্রাণপণে সাইকেল ছুটিয়ে চলল।

অনুর্বর উঁচু-নীচু অসমান পাথুরে মাঠ। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের স্তূপ। এ পথে হেঁটে চলাও কঠিন ব্যাপার, সাইকেল চালানো ত দূরের কথা। তবু এ ছাড়া আর গতি কি? যে দিকে একটু সুবিধা

পাচ্ছে— সেই দিকেই তারা দুরন্ত বেগে সাইকেল চালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তারা জানে না, সামনে আবার তাদের জন্যে কী বিপদ অপেক্ষা করছে— সে কথা ভাববার সময়ও তাদের এখন নেই। বর্তমানের চিন্তায় তারা এখন আকুল।

আগে আগে ছুটেছে প্রণব পিছনে চলেছে প্রশান্ত।

প্রশান্ত চিৎকার করে প্রণবকে বললে— প্রণব, বন্দুক চালাব?

কথাটা কানে যেতেই সাইকেলের গতি থামিয়ে প্রণব আশ্চর্য হয়ে বললে কাকে গুলি করবে প্রশান্ত, লোকগুলো কি আমাদের অনুসরণ করছে নাকি! সর্বনাশ।

প্রশান্ত বলল— সেই বিটকেল কুকুরটা আমাদের পিছনে পিছনে ছুটে আসছে, ওটাকে ঘায়েল করতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

প্রণব বললে— না, এখন বন্দুকের শব্দ করে কাজ নেই। আমাদের এখন আত্মগোপন করে থাকতে হবে। বন্দুকের কর্কশ শব্দ এই নিস্তব্ধ অসীম শূন্যতা ভেদ করে ঐ লোকগুলিকে আমাদের অস্তিত্বের খবর জানিয়ে দেবে। তাহলে আবার বিপদে পড়তে হবে। দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি।

সাইকেল থেকে নেমে, প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই তুলে প্রণব কুকুরটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে গেল, কিন্তু কুকুর কই? অবাক হয়ে প্রণব আর প্রশান্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখল, সামনে পিছনে আশে-পাশে কোথাও কুকুরটার চিহ্নমাত্র নেই।

পাঁচ

ভোর হতে তখনও কিছু বাকী।

একটা পাহাড়ের ধারে প্রণব আর প্রশান্ত এসে পৌঁছেছে। বাকী রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেবে— তারা ঠিক করলো।

যাক কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল— প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বললে— ভোর হলেই আমরা পথের খোঁজ পাবো— নিকটের গ্রাম থেকে।

একটু মুচকি হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—তুমি যে জেগে জেগেই গ্রামের স্বপ্ন দেখছো প্রণব— ধারে-কাছে কোনো লোকালয় আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমরা যে এখন কোথায় এসে পড়েছি তার কিছুই ধারণা করতে পারা যাচ্ছে না।

প্রণব বললে— নিশ্চয় খুব কাছেই লোকের বসতি আছে, ঐ শোন মুরগীর ডাক।

কান খাড়া করে প্রশান্ত শুনতে পেল, সত্যিই দূর থেকে মুরগীর ডাক ভেসে আসছে। আনন্দে তার মনটা নেচে উঠল। যাক, এইবার তাহলে পথের খবর পাওয়া যাবে।

কুয়াশা তখনো ভালো করে কাটে নি অথচ ভোর হয়ে গেছে। আর একটু পরিষ্কার না হলে রওনা হওয়া যায় না। এখনো দূরে ভালো করে দৃষ্টি চলে না।

সাইকেল দুটো একটা পাথরে হেলান দিয়ে রেখে— আর একটা পাথরের উপর দুই বন্ধু বসে বিশ্রাম করছে— এমন সময়,— ও কিসের শব্দ ?

সভয়ে দুই বন্ধু পাথর ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড পাথর পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে তাদের দিকে হুড়মুড় করে নেমে আসছে।

সর্বনাশ !!

প্রণব চিৎকার করে বললে— পাশের দিকে দৌড়ে সরে যাও প্রশান্ত, পাথরটা ঘাড়ে পড়লে একদম ছাতুর মতো গুঁড়ো হয়ে যাবে — এই বলতে বলতে সে নিজেও একপাশে ছুটে গেল।

প্রণব আর প্রশান্ত আত্মরক্ষা করলো বটে— কিন্তু সেই প্রকাণ্ড পাথরটা প্রচণ্ড বেগে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল তাদের সাইকেল দুটোর উপরে। আর তাদের চোখের সামনেই সাইকেল দুটো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে

পড়ল পাথরটার চাপে।

এই অপ্রত্যাশিত বিপদে প্রশান্তর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবার যোগাড়। প্রণবও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

ভাগ্যিস্ রাইফেল দুটো তাদের হাতে ছিল, সাইকেলে বাঁধা থাকলে তাদের অবস্থাও হতো আজ শোচনীয় এই শত্রু পরিবেষ্টিত স্থানে অস্ত্রশূন্য হয়ে থাকা যে কীরকম বিপজ্জনক তা বোধ হয় আর না বললেও চলবে।

একি ব্যাপার হল প্রণব ? পাথরটা এ ভাবে গড়িয়ে পড়ল কী করে ? ভাগ্যিস্ আমাদের ঘাড়ে পড়ে নি। প্রশান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

প্রশান্তর কথার উত্তর না দিয়ে— প্রণব হঠাৎ প্রশান্তর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বললে পালাও প্রশান্ত, প্রাণপণে ছোটো— ঐ দ্যাখো আর একটা পাথর গড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমার মনে হচ্ছে এ কোনো শয়তানের কাণ্ড। আমাদের মারবার ফন্দি করছে।

সাইকেল দুটো পাথরের তলায় চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে আছে ; দুই বন্ধু রাইফেল দুটো দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে দৌড়তে লাগল সামনের দিকে।

পিছনে আবার ও কিসের শব্দ। ছুটতে ছুটতে প্রশান্ত একবার পিছনের দিকে তাকাল— তারপর রুদ্ধকণ্ঠে প্রণবকে বললে সর্বনাশ, প্রণব— ঐ দ্যাখো সেই কুকুরটা আমাদের তাড়া করেছে।

প্রণব তেমনি ভাবে ছুটতে ছুটতেই একবার ফিরে তাকাল— তারপর বলে উঠল আর্তস্বরে— শুধু কুকর নয় প্রশান্ত ; কুকুরের পিছনে ছুটে আসছে কয়েকটা দুর্বৃত্ত লোক ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো।

ছয়

কুয়াশা কেটে চারিধারে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রণব আর প্রশান্ত আর কোনো উপায় না দেখে একটা পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

এদিকে অগুনতি ছোট ছোট পাহাড়। আফ্রীদিদের দল এতক্ষণ

তাদের তাড়া করেছিল, কিন্তু এখন আর প্রণবদের খুঁজে পাচ্ছে না। ভয় হচ্ছে ঐ মারাত্মক কুকুরটার জন্য। ও আবার গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাদের খুঁজে বের না করে!

প্রশান্ত ফিসফিস করে বললে প্রণব, নিশ্চয়ই ওরা এখনো আমাদের খোঁজ করছে। আমরা এখন যে ভাবে আছি— চট করে ওদের নজরে পড়বো না— পাথরের আড়ালে—

প্রশান্তর মুখের কথা তখনো ফুরায় নি, এমন সময় চকিতের মধ্যে তার মুখ চেপে ধরে প্রণব অস্ফুটস্বরে বললে, চুপ চুপ, ঐ ছাখো দুটো লোক নীচের ঐ ঢালু পথটার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছে, তাদের সঙ্গে ঐ কুকুরটা—

প্রশান্ত ভালো করে লোক দুটোকে লক্ষ্য করে দেখল, তারপর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে প্রণবকে বললে চালাও গুলি প্রণব, ও দুটোকে খতম করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই—

মুহূর্তের মধ্যে তার হাত চেপে ধরে প্রণব বললে, সর্বনাশ প্রশান্ত, এমন কাজও করো না। আমাদের গুলিতে লোক দুটো ঘায়েল হতে পারে বটে কিন্তু এর পরিণাম হবে রোমাঞ্চকর। ওদের হত্যা করলে সমগ্র আফ্রীদি জাতি উঠবে আমাদের উপর ক্ষেপে। প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে ওদের মনে, তারপর যে কোনো প্রকারেই হোক ওরা আমাদের ধরবেই। সুতরাং এখন বিশেষ ভেবে-চিন্তে আমাদের কাজ করা দরকার। ওই লোক দুটির পিছনে আরো দল আছে সে কথা তোমার অজানা নেই।

প্রণবের কথায় বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রশান্ত বললে ঠিক বলেছ প্রণব, বিশেষ ভেবে-চিন্তে এখন আমাদের কাজ করা কর্তব্য— গোঁয়ারের মতো চট করে কিছু করে বসা মানেই নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনা।

প্রণব উত্তর দিল— যখন আর আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় থাকবে না,

কেবল সেই সময়েই আমরা রাইফেলের সদ্ব্যবহার করবো, তার আগে নয়।

কিন্তু কি অপরাধ করেছি আমরা যার জন্যে আমাদের উপর ওদের এতটা আক্রোশ। কিছুক্ষণ আগে পাথর চাপা দিয়ে ওরা আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল— প্রশান্ত বললে।

বাস্তবিক কি অপরাধ যে আমাদের তা আমরা নিজেরাই জানি না, আমার মনে হয় ঐ হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলেই ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে, তাই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ওরা আমাদের এইভাবে অনুসরণ করছে। প্রণব উত্তর দিলে।

প্রশান্ত ভুরু কুঁচকে বললে, তাই যদি হয় তা হলে এখন উপায় ?

উপায় হচ্ছে— কোনো রকমে লাণ্ডিখানায় গিয়ে পৌঁছানো। আমরা যদি কোনো রকমে রাস্তার খোঁজ পেতে পারি— তা হলেই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আজ সারাদিনটা আমাদের এই ভাবেই এখানে কাটাতে হবে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা পথের খোঁজ করবো। টর্চ দুটো আমাদের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা আছে কাজেই বিশেষ অসুবিধা হবে না। এই বলে প্রণব একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল।

প্রশান্ত বলল, আচ্ছা, আমরা যখন সাইকেল দুটো রেখে একটা পাহাড়ের নীচে বসে বিশ্রাম করছিলাম, তখন তো ওরা অনায়াসে পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে আমাদের ধরে ফেলতে পারতো। তা' না করে পাথর গড়িয়ে আমাদের মারবার চেষ্টা করলো কেন ওরা ?

প্রণব সহজ ভাবেই উত্তর দিল, এই সামান্য কথাটা আর বুঝতে পারছো না প্রশান্ত। ওরা বেশ ভালো করে লক্ষ করে দেখেছে আমাদের হাতের রাইফেল দুটো। আমাদের ভয় না করলেও ওরা রাইফেলকে ভয় করে যথেষ্ট। তাই আমাদের কাছে আসবার ভরসা হচ্ছে না ওদের। দূরে থেকেই ফন্দি-ফিকির করে আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা ওদের। খুব সাবধান, নিমেষের জন্যও বন্দুক হাতছাড়া কোরো না যেন। ঐ বন্দুকই হচ্ছে এখন আমাদের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু।

ঐ— ঐ আরো কয়েকটা লোক পা টিপে টিপে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। ঐ যে, একজন উপরে আমাদের এই দিকে তাকাচ্ছে, শীগ্‌গির বড় পাথরটার পাশে মাথা নীচু করো, প্রণব—

প্রণব আর প্রশান্ত নিমেষের মধ্যে একটা বড় পাথরের আড়ালে মাথা নীচু করে বসে পড়ল।

ওঃ, আর একটু হলেই ধরা পড়ে গেছল আর কি!

সাত

অতি অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার।

কিছুক্ষণ আগে যে লোকগুলি পা টিপে টিপে পাহাড়ের নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তারা ফিরেছ চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে। মুখে তাদের ভীতি বিহ্বল আর্তনাদ, কুকুরটাও ছুটছে প্রাণ-পণে, আর মাঝে মাঝে পিছনের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ করছে।

এ আবার কি ব্যাপার!

এই দৃশ্য দেখে প্রশান্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে একটু মৃদু হেসে বললে— উঃ— যাক্ এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, লোকগুলি আবার ফিরে যাচ্ছে ; কিন্তু এ রকম ছুটে চলেছে কেন প্রণব?

প্রণব বিশেষ লক্ষ করে এই দৃশ্যটা দেখছিল, এইবার গম্ভীর হয়ে বললে, হাসবার কথা নয় প্রশান্ত! আমার মনে হচ্ছে লোকগুলি কোনো কারণে ভয়ংকর ভয় পেয়ে ঐভাবে ছুটে চলেছে, শুনছো না ওদের অস্ফুট আর্তনাদ, কুকুরটাও কি ভাবে ডাকতে ডাকতে ছুট দিচ্ছে— ঐ ছাখো। যথেষ্ট ভয়ের কারণ না ঘটলে এ ব্যাপার হতে পারে না।

প্রশান্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে, এখানে আবার ভয়ের কারণ কি থাকতে পারে প্রণব— ঐ রকম হিংস্র দুর্দান্ত আক্রীদির দল তো সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়।

আমিও তো তাই বলি প্রশান্ত— প্রণব উত্তর দিল। ভয়ংকর কোনো ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে আমার ধারণা, কিন্তু সে কারণটা যে কি, আমি কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না। ঐ ছাখো এখনও লোকগুলি উঠি পড়ি করে কিভাবে ছুটে চলেছে, সবচেয়ে বেশি দৌড়াচ্ছে ঐ কুকুরটা।

যে জায়গায় দুই বন্ধু আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে চারিধারের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে অবারিত অনুর্বর মাঠ। মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ঝোপ, আর কালো পাথরের স্তূপ।

এত বড় একটা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর অথচ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বন-জঙ্গলের নামমাত্র নেই কোনোখানে। কয়েকটি খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছও দৃষ্টিগোচর হয় না। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে রুক্ষ শুষ্ক অসমান মাঠ।

লোকগুলি অনেক দূর চলে গেছে, আর ভালো করে দেখা যায় না। দলে অন্তত দশ বারো জন লোক ছিল।

প্রশান্ত বললে, প্রণব, আর এখানে সময় নষ্ট করে কাজ কি, শত্রুর ভয় তো কেটে গেছে, এইবার এসো দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা পথের সন্ধান করি। আর পৃথিবী ভ্রমণে কাজ নেই, চলো মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

অতি নিবিষ্ট হয়ে প্রণব একদৃষ্টে এতক্ষণ কি জানি লক্ষ করছিল, প্রশান্তর কথার উত্তর না দিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠল— ছাখো তো প্রশান্ত, ঐ দিগন্ত সীমায়, মাঠের শেষে কিছু দেখতে পাও কিনা!

সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশান্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলে উঠল, একি প্রণব, পিঁপড়ের সারির মতো ও কী চলেছে, কী অদ্ভুত চেহারা ওদের, ও কী ধরনের মানুষ ওরা?

প্রণব বললে, মানুষ নয়, ওগুলি উটের সারি। ওদের সঙ্গে অবশ্য মানুষও আছে। আমার মনে হয়— এইবার আমরা পথের খোঁজ পাব, নিশ্চয় ওটা ভারতগামী পথ। যাত্রীর দল ঐ পথ ধরে পেশোয়ারের দিকে চলেছে।

সোল্লাসে প্রশান্ত চিৎকার করে উঠল, 'হুররে, আর দেরি করা নয়, এক্ষুণি চলো প্রণব, ঐ পথের সন্ধানে। এখন সবে মাত্র বেলা দশটা, পথ খুঁজে বের করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চলো প্রণব।

এই বলে প্রশান্ত রাইফেলটা কাঁধে করে নবীন উৎসাহে রওয়ানা হতে উদ্যত হল।

প্রণব বললে, থামো প্রশান্ত, একটু অপেক্ষা করো। আমার পকেটে একটুকরো পাউরুটি আছে। ভাগাভাগি করে সেটুকু শেষ করে ফেলা যাক,— ক্ষিধের চোটে নাড়ীভুঁড়ি হজম হওয়ার যোগাড়। পরিশ্রম তো আর কম হয় নি।

সে কথা মন্দ নয়, দুঃখ হচ্ছে সাইকেলে বাঁধা খাবারগুলির জন্যে। অমন টাটকা মাখন আর জেলিগুলি এভাবে নষ্ট হোলো— বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলি প্রশান্ত বললে।

ভাগাভাগি করে রুটিটা দুই বন্ধু বসে শেষ করে ফেললে।

প্রণব বললে, এইবার চলো প্রশান্ত ওঠা যাক, সকলের আগে এখন একটু জলের খোঁজ করা দরকার। পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

এখানে জল পাবে কোথায় প্রণব? আশ্চর্য হয়ে প্রশান্ত বললে।

পাহাড়ের নীচে অনেক সময় পাথরের ধারে জল জমে থাকে। দুই একটা ছোটখাটো ঝরনার খোঁজও হয়তো আমরা পেতে পারি। আমি কিন্তু ঝরঝর করে একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দেখা যাক একবার চেষ্টা করে। প্রণব বললে।

আট

পাহাড়ের নীচে নেমে এসে বন্ধু দু'জনে জলের খোঁজ করতে লাগল। বাস্তবিকই মনে হল যেন কিছুদূরে একটা পাহাড়ের আড়ালে ঝরঝর করে কিসের জানি একটা একটানা শব্দ হচ্ছে।

নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোথাও ঝরনা আছে, প্রশান্ত উৎসাহের সঙ্গে

প্রণব বললে— এসো আমরা একটু এগিয়ে জলের খোঁজ করি।

শব্দ একটা শুনতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু ওটা ঝরনার শব্দ কিনা ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না,— যাই হোক, খোঁজ করা দরকার। কাছাকাছি একটা লোকালয় পেলে সবচেয়ে ভালো হত। প্রশান্ত বললে।

কাছাকাছি গ্রাম আছে এ ধারণা আমার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছিল, শুনছিলে তো ভোরবেলায় মুরগীর ডাক! কিন্তু এই পাহাড়ের উপর থেকে চারিধারে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে কোথাও কোনো জনপদের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। এখন মনে হচ্ছে ও বোধ হয় পাহাড়ী মুরগীর ডাক।

পাশাপাশি ছোট বড় অনেকগুলি পাহাড়। আসল হিমালয়ের শাখা এগুলি না হলেও ভিতরে ভিতরে হয়তো যোগাযোগ আছে। একটা জিনিস লক্ষ করবার বিষয়, পাহাড়গুলিতে বেশি গাছপালা নেই— একদম নেড়া পাহাড়।

এ বিষয়ে প্রণবরা নিশ্চিন্ত। বুনো-জন্তুদের ভয় বিশেষ এখানে নেই। পাহাড়ে যদি জঙ্গল থাকত— তা হলে বুনো-জন্তুর উৎপাতও হয়তো তাদের সহ্য করতে হত।

ঝরনার শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই শব্দ লক্ষ করে প্রণব আর প্রশান্ত মহা উৎসাহে পথ চলেছে।

হঠাৎ সামনে পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মুখের ধারে তারা এসে উপস্থিত।

তাই তো, এ পথে আর যাওয়া চলবে না প্রশান্ত, সামনে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মুখ আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। উঃ, সুড়ঙ্গের ভিতরটা কী অন্ধকার প্রণবের মুখের কথা শেষ হতে না হতে,— একটা বিকট অট্টহাসি শুনে প্রণব আর প্রশান্ত চমকে উঠল।

হা-হা-হা-হা-হা,— সেই ভয়ংকর হাসির শব্দে সমস্ত পাহাড়টা যেন ভূমিকম্পের মতো থরথর করে কেঁপে উঠল।

তারপর— যে দৃশ্য দুই বন্ধুর চোখের উপর ভেসে উঠল তাতে



তাদের শরীরের রক্ত জল হবার যোগাড়।

খট খট শব্দ করতে করতে একটা মানুষের কঙ্কাল সেই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো। আবার সেই অট্টহাসি— হা-হা-হা-হা-হা।

প্রণব আর প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে তাদের একটি কথা বের হল না, সামান্য একটু নড়বার চড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের লোপ পেয়ে গেল। যেন কোনো অদৃশ্য শক্তিতে কেউ তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে।

জীবন্ত কঙ্কালটা ঘাড় বেঁকিয়ে বন্ধু দুজনের দিকে একবার তার কোটরগত চোখ দিয়ে ভালো করে তাকাল, তারপর দুই হাতে দুজনের কব্জি চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল সুড়ঙ্গের ভিতরে। ঝাকুনির চোটে টোটাভরা রাইফেল দুটো তাদের হাত থেকে খসে গিয়ে পড়ে রইল মুখের কাছে বাইরে।

সুড়ঙ্গের ভিতরটা বেশ সুবিস্তীর্ণ। একজন দীর্ঘকায় লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুড়ঙ্গের ভিতর চলতে পারে,— বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না।

জীবন্ত কঙ্কালটা লম্বায় প্রণবদের প্রায় দেড়গুণ। সে একটু ঝুঁকে পড়ে বেশ স্বচ্ছন্দে সুড়ঙ্গের ঢালুপথে নেমে চলেছিল, কিন্তু প্রণবদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

কঙ্কালটা তার হাড্ডি-সার হাত দিয়ে এত জোরে প্রণবদের কব্জি চেপে ধরেছে, যে কব্জির যন্ত্রণায় তারা অস্থির— তার উপর কঙ্কালটার হ্যাঁচকা টানে তারা যে কতবার মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে— তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।

তবে কি প্রণবরা শেষকালে ভূতের পাল্লায় পড়ল? কিন্তু ভূত তো কেবল দূরে থেকেই ভয় দেখায়, মানুষের শরীর স্পর্শ করে— এ রকম ঘটনা তো কখনো শোনা যায়নি।

কিন্তু এ যে একেবারে জীবন্ত ভূত, প্রাণবন্ত কঙ্কাল। কী ভয়ঙ্কর শক্তি তার ঐ হাড়-জিরজিরে শরীরে। ভূত তো শোনা যায় ছায়াময়

অশরীরী জীব, কিন্তু এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ জলজ্যান্ত, স্থূলরূপী জীব বিশেষ। তবে কি এটা ?

এতক্ষণ সুড়ঙ্গের ভিতরটা ছিল জমাট অন্ধকারে ঠাসা,— এইবার কঙ্কালটা যে জায়গায় এসে থামল সে জায়গায়টা ততটা অন্ধকার নয়— বাইরের থেকে কোনো ছিদ্রপথে যেন আলোর ধারা নেমে এসে সেখানটা ক্ষীণ আলোকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। জায়গাটা অনেকটা বাঁধানো গোল চৌবাচ্চার মতো।

প্রণব আর প্রশান্তকে ঘাড়ে ধরে সেখানে বসিয়ে দিয়ে— আবার সেই প্রাণকাঁপানো বিকট 'হা-হা' শব্দ করতে করতে সেই কঙ্কালটা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নয়

অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

ভয়ংকর কঙ্কালটা সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারপর আর এখন পর্যন্ত তার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রণব আর প্রশান্ত এতক্ষণ পর্যন্ত দু'জনে নির্বাক হয়ে আবিষ্টের মতো পড়েছিল।

এ যেন মস্ত বড় একটা দুঃস্বপ্ন। এর চেয়ে আফ্রীদিদের হাতে বন্দী হওয়াও যে ঢের ভালো ছিল। সেই পাথরের চাপে তখন তারা মারা গেল না কেন ?

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ঘটনা। অসহায়ের সহায়, বিপদের একান্ত বান্ধব সেই রাইফেল দুটোও আজ হাতছাড়া হয়েছে। প্রাণের আর বিন্দুমাত্র আশা-ভরসা নেই। মৃত্যু তো আসন্ন. কিন্তু কি রকম নিষ্ঠুর— কি রকম লোমহর্ষণ মরণ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে ! ওঃ, সেই বিকট কঙ্কাল-মূর্তিটার কথা ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

প্রণব মৃদুস্বরে প্রশান্তকে ডাকল— প্রশান্ত !

প্রশান্ত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল,— তার সমস্ত শরীরটা তখনো কাঁপছে। প্রণবের ডাকে সে তেমনি অবস্থাতেই উত্তর দিল— উঁ।

প্রণব বললে— অত ঘাবড়ে গেলে চলবে না প্রশান্ত,— সাহসে বুক বাঁধো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমরা দু'জনে আছি,— তোমার গায়ে যথেষ্ট বল আছে, হয়তো চেষ্টা করলে ওর হাত থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

কথাটা শুনে প্রশান্ত শিউরে উঠল— এ্যাঁ, তুমি বলছ কি প্রণব পাগলের মতো,— ভুতের সঙ্গে আবার মানুষ লড়তে পারে নাকি?

প্রণব উত্তর দিল— ভূত কিংবা প্রেতাত্মা কখনোই নয় ওটা। ভূত-প্রেতরা কখনো স্থূলশরীর ধারণ করতে পারে না। তারা হয়ত দূর থেকে মিথ্যা শরীর ধরে লোককে ভয় দেখাতে পারে— কিন্তু বাস্তবিক জড়দেহ ধারণ ওরা করতে পারে না,— এটা তুমি নিঃসন্দেহে জেনো।

প্রশান্তর আর বিস্ময়ের শেষ নেই। বিস্ফারিত নয়নে সে প্রণবের দিকে চেয়ে বললে— এ্যাঁ, তুমি বলছ কি প্রণব, তবে ওটা কি?

ওটা— আমার তোমার মতোই স্থূলদেহধারী জীব। এর বেশি আমি এখন আর কিছুই স্থির করতে পারছি না। এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেন কিছুক্ষণ আগে ঐ আক্রীদিগুলি এদিকে পানে এসে আবার প্রাণভয়ে ছুট দিয়েছিল, আর কুকুরটাই বা কোন্ দৃশ্য দেখে ঐ ভাবে ভয়ংকর আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালিয়েছিল, নিশ্চই ওরা এই জীবন্ত কঙ্কালটিকে দেখতে পেয়েছিল।'

তবে এখন উপায় প্রণব? প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে।

উপায় হচ্ছে সবার প্রথমে মনে বল সঞ্চয় করা—তারপর ঐ কঙ্কাল-রূপী জীবনটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা। শেষ পর্যন্ত যদি জোর খাটাতে হয়— তাও আমাদের করতে হবে। ও একা, আমাদের দু'জনের সঙ্গে না-ও পেরে উঠতে পারে। প্রণব সবেমাত্র কথা বন্ধ করেছে এমন সময় সমস্ত সুড়ঙ্গটা ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল।

হা-হা-হা-হা-হা ; বন্ধু দুজন তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিকট কঙ্কালমূর্তিটা অট্টহাসি হাসছে, হাতে তার একছড়া পাকা-কলা আর কয়েক টুকরো খেজুর।

কলা আর খেজুরগুলি প্রণবদের কাছে ছুঁড়ে ফেলে— আবার সেই রকম হাসতে হাসতে মূর্তিটা সুড়ঙ্গের মুখের দিকে চলে গেল।

এ কি রকম রহস্য প্রণব ! এ যে জোর করে রসিকতা হচ্ছে দেখছি। যমের দুয়ারে ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার যে দেখছি দয়ায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আমরা পাছে ক্ষিধেতে কষ্ট পাই— তাই আবার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল দেখছি। খাইয়ে-দাইয়ে মোটা-সোটা করে টুঁটি টিপে মারবে নাকি ! প্রশান্ত রহস্য ছলে বলল।

আগে তো খেয়ে নেওয়া যাক— তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে। কলা আর খেজুরগুলি বেশ তাজা ; শরীরে একটু জোর হলে মনেরও জোর বাড়বে। এই বলে প্রণব টপাটপ খোসা ছাড়িয়ে কলাগুলি খেতে আরম্ভ করলো। প্রশান্তর খাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না, দুই একটি মাত্র মুখে দিল।

খাওয়া শেষ করে প্রণব বললে এসো, এক কাজ করা যাক। টর্চ বাতিগুলি এখনো আমাদের কাছে অক্ষতভাবেই আছে। সেই আলোতে এসো আমরা সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত যাই— রাইফেলগুলি আমাদের আগে হাতানো দরকার। যদি কঙ্কালমূর্তি আমাদের বাধা দিতে আসে আমরা এবার শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব। আমার সঙ্গে বেল্টে বাঁধা যে ছোরাটা আছে— সেটা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। চলে এসো প্রশান্ত,— এখানে যত ভয় পাবে, ভয় আরো তত বেশি করে পেয়ে বসবে। এই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে এখন চাই দুর্জয় মনের বল, চাই অদম্য উৎসাহ— চাই অসাধারণ বুদ্ধি।

এই বলে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সুড়ঙ্গের পথে এগিয়ে চলল প্রণব, তার পিছনে পা টিপে টিপে চলল প্রশান্ত।

যদি কোনো রকমে একবার সুড়ঙ্গের মুখের কাছে পৌঁছতে পারে

আর রাইফেল দুটো উদ্ধার করা যায়— তা হলে এবার একবার দেখে নেবে এই কঙ্কাল শয়তানকে।

কিন্তু একি! সুড়ঙ্গের মুখের কাছে এসে প্রণব থমকে থেমে গেল; ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল— সর্বনাশ প্রশান্ত, এই ছাখো, সুড়ঙ্গের মুখটা প্রকাণ্ড এক পাথর-চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এ পথে বেরুবার আর কোনো উপায় নেই।

মাথায় হাত দিয়ে প্রশ্যন্ত বসে পড়ল— সর্বনাশ, সর্বনাশ, এ যে আমাদের জীবন্ত সমাধি হল দেখতে পাচ্ছি।

দশ

হায় হায় হায় হায়···জীবনের আর কোনো আশা নেই, এই মৃত্যুগহ্বর থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো উপায় নেই।

দু'জন প্রাণপণ শক্তিতে সুড়ঙ্গের মুখের পাথরটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করলো— কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম বৃথা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ, বিরাট পাথরটাকে তারা সরানো দূরের কথা একটু নাড়াতে পর্যন্ত সক্ষম হল না।

প্রণব আর প্রশান্ত আবার ফিরে এলো সেই চৌবাচ্চার মতো বাঁধানে জায়গাটায়।

প্রশান্তর শরীরে শক্তি নেই, মনে তেজ নেই, সে একেবারে এলিয়ে পড়েছে ফাঁসীর মঞ্চে ওঠা আসামীর মতো।

প্রণব ভিতরে ভিতরে এবার যথেষ্ট দমে গেলেও, মুখে তার উৎসাহের ভাটা পড়ে নি।

প্রশান্তর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে সে তাকে নব উৎসাহে উদ্দীপিত করে বললে তুমি যে এর মধ্যেই সব হাল ছেড়ে দিলে প্রশান্ত,— তা'হলে দেখছি তুমি এখানেই কায়েমী বাসের ব্যবস্থা করছো, আমার কিন্তু এখানে থাকবার একটুও ইচ্ছা নেই।

প্রশান্ত এইবার মুখ খুলল। বললে অসম্ভব এই মৃত্যু-গহ্বর থেকে

রক্ষা পাওয়া। একটি মাত্র উপায় আছে—

সোৎসাহে প্রণব বললে কি উপায় প্রশান্ত!

প্রশান্ত বললে আমাদের এখন স্থির হয়ে ঐ কঙ্কাল-মূর্তিটার আগমন প্রতীক্ষা করতে হবে। সুড়ঙ্গের মুখের পাথরটা সরিয়ে ও যখন ভিতরে ঢুকবে তখন তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে কাবু করে ফেলে আমরা গর্ত থেকে পালাব।

তোমার বুদ্ধিটা তারিফ করবার মতো প্রশান্ত! কিন্তু কঙ্কাল-মূর্তিটা যদি আর না ফেরে! দেখলে না কি রকম ভাবে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে,— আমার তো মনে হয় না— ভবিষ্যতে ও আর এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করবে।

প্রণবের কথায় প্রশান্ত শিউরে উঠল। সর্বনাশ!! তবে উপায়?

প্রণব একবার ভালো করে সুড়ঙ্গের উপরের দিকে চাইল, তারপর বললে— একটা জিনিস লক্ষ করেছ প্রশান্ত— উপর থেকে কোনো বাঁকা ছিদ্রপথ দিয়ে রোদের আভা এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকছে, ফুরফুরে বাতাসও না জানি কী অদ্ভুত উপায়ে এই গর্তের ভিতর এসে প্রবেশ করেছে। আমার মনে হচ্ছে উপরে নিশ্চয়ই কোন ছিদ্র আছে। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও তো প্রশান্ত, আমি তোমার কাঁধের উপর চড়ে একবার দেখি বাইরে যাবার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা।

প্রশান্ত মুখে কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে নেমে এসেছে একটা হতাশার ছাপ, একটা নৈরাশ্যের ছায়া। জীবন্ত যে তারা এই মৃত্যু-গহ্বর থেকে পরিত্রাণ পাবে সে আশা আর তার নেই।

মাথার উপরে থাক থাক পাথর সাজানো, স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে সূর্যের আলো আর বাইরের বাতাস সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করছে।

প্রশান্তর কাঁধের উপর চড়ে প্রণব উপরের একটা পাথরের থাক চেপে ধরল দুই হাতে, তারপর হাতে ভর দিয়ে উপর দিকে ঝুঁকে পড়ে

আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল প্রশান্ত, প্রশান্ত— ঐ যে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ,— এই পথ দিয়ে আমরা নিশ্চয় বাইরে যেতে পারব ; ঐ যে একটু উপরেই একটা গাছের শিকড় ঝুলছে, ওটা ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনার কারণ থাকবে না। আমাদের আর ভয় নেই। এই বলে প্রণব প্রাণান্তকর চেষ্টায় উপরে শিকড়টা একহাতে শক্ত করে ধরে ফেলল, তারপর একলাফে উপরের পাথরের একটা থাকের উপর উঠে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে প্রশান্তর মনেও আবার যেন লুপ্ত উৎসাহ ফিরে এলো, ঘুমন্ত শক্তি যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। তা হলে বাস্তবিক উদ্ধারের আশা এখনও যায় নি! প্রশান্ত যেন অকূল সমুদ্রে কুলের সন্ধান পেল। প্রশান্ত বললে— প্রণব, তুমি তো বেশ নিরাপদ জায়গায় উঠে বসলে কিন্তু আমি অত উঁচুতে উঠি কি করে,— আমাকে কাঁধে করে তুলবে কে ?

তার ব্যবস্থা আমি করছি প্রশান্ত, মনে ভেব না তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি সরে পড়ব— প্রণব তার কোমরের বেল্টটা খুলতে খুলতে বললে।

আরে না না সে কথা আমি বলছি না। তাড়াতাড়ি এখন এই ভয়ংকর স্থানটা আমাদের ত্যাগ করা দরকার,— কখন কোন্ মুহূর্তে আবার সেই জীবন্ত কঙ্কালটা এসে পড়ে তার ঠিক কী! আমাদের এভাবে পালাতে দেখলে মহা ফ্যাসাদেই পড়তে হবে— হয় তো আমাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি হবে।

নীচের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে প্রণব বেল্টটা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রশান্তকে বললে "শক্ত করে বেল্টটা ধর প্রশান্ত, কোনো ভয় নেই,— আমি তোমাকে টেনে উপরে তুলছি।

প্রশান্ত শক্ত করে বেল্টটা চেপে ধরল, আস্তে আস্তে প্রণব তাকে উপরের দিকে টেনে তুলতে লাগল।

আর একটুমাত্র বাকী, ঐ যে হাতের কাছে পাথরের থাকটা, ওটাকে

ধরতে পারলেই নিশ্চিন্ত। প্রশান্ত এক হাতে বেল্টটা চেপে ধরে আর এক হাতে পাথরটা ধরতে চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক এমনি সময়— হা-হা-হা-হা-হা ভয়ংকর অট্টহাসির শব্দে চারিধার কেঁপে উঠল।

প্রণব তাকিয়ে দেখল প্রশান্তের ঠিক পায়ের তলে কঙ্কাল-মূর্তিটা এসে দাঁড়িয়ে প্রশান্তকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রণব প্রশান্তকে উপরে তুলে ফেলল।

এগারো

আর একটু দেরি হলেই হয়েছিল আর কি। প্রশান্ত বরাত জোরে আজ খুব বাঁচা বেঁচে গেছে,— ঐ বিরাট কঙ্কাল-মূর্তিটা তার সুদীর্ঘ অস্থি-সার হাত দিয়ে এখুনি প্রশান্তের ঝুলন্ত পাটা ধরে ফেলত। ভাগ্যিস প্রণব এক হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে উপরে তুলে ফেলেছিল!

গর্তের বাইরে বের হয়ে এসে প্রণব রুদ্ধশ্বাসে বললে, প্রশান্ত আর দেরি করা ঠিক নয়— এইবার চল আমরা পালাই যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে।

প্রশান্তর শরীরটা দারুণ উত্তেজনায় তখনো ঠকঠক করে কাঁপছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে— একটু বসো ভাই প্রণব, একটু জিরিয়ে নি।

জিরোবার ঢের সময় পরে পাওয়া যাবে প্রশান্ত, এখন আর এখানে থাকা কোনো মতেই উচিত নয়। স্থির জেনো, কঙ্কাল-মূর্তিটা আমাদের সহজে ছাড়বে না।

প্রণবের কথা শেষ হতে না হতেই প্রশান্ত আঁতকে উঠল,— বলে উঠল, ঐ দ্যাখো প্রণব নীচের দিকে পাথরের আড়ালে— এই বলে প্রশান্ত এক রকম প্রায় গড়াতে গড়াতেই পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল।

প্রণব এক মুহূর্তের জন্য একবার নীচের দিকে তাকাল, দেখল সেই জীবন্ত কঙ্কালটা ছুটতে ছুটতে লাফাতে লাফাতে উপরের দিকে উঠে আসছে।

গর্তের মুখ বেয়ে তারা যে জায়গায় এসে উঠেছিল সে স্থানটা মাটি থেকে অনেকটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে।

প্রশান্ত এক রকম প্রায় গড়িয়ে গড়িয়েই নামছে,— তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে প্রণবও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল,— তারপর সেও পিছল নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে সবেগে নীচে নামতে লাগল।

নীচে নেমেই আর কথাবার্তা নেই। শরীর তাদের ছড়ে গেছে, হাত পা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে থেঁতলে গেছে কিন্তু এসব ভাববার সময় তাদের এখন নেই। তারা এখন শুধু বাঁচতে চায়,— ঐ কঙ্কাল-দৈত্যটার হাত থেকে কোনোরকমে রক্ষা পেতে চায়। প্রাণপণে তারা ছুট দিল যে দিকে তাদের দু'চোখ চলে।

প্রণব একবার ফিরে তাকাল,— দেখল কঙ্কাল-দানবটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর বিকট অট্টহাসি হাসছে— হা-হা-হা-হা-হা।

এখন অনেকটা নিরাপদ। প্রশান্ত একবার পিছন দিকে ফিরে তাকাল, তারপর কৌতূহলের সঙ্গে প্রণবকে বলল ঐ ছাখো, দানবটার দুই হাতে দুটো কালো কালো কি দেখা যাচ্ছে।

প্রণব নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দানবটাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ও দুটো আর কিছুই নয়, আমাদের পরিত্যক্ত রাইফেল দুটো।

কি সর্বনাশের কথা; ও কি আবার রাইফেল চালাতে জানে নাকি? আমাদের আবার তাগ করবে না তো! বাপরে কী সর্বনেশে জীব। রাইফেলের গুলি অনেক দূর পর্যন্ত যায়। এখনো আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। প্রণব, চলো আরো খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক। ঐ যে দূরে গম্বুজের মতো কি একটা দেখা যাচ্ছে, চলো ঐ দিক লক্ষ করে আমরা এগিয়ে চলি। বোধ হয় শীগ্‌গিরই এবার আমরা লোকালয়ের সন্ধান পাব।

পশ্চিম দিকে সূর্য হেলে পড়েছে। দিন শেষ হবার আর বেশি

বাকী নেই। অবসন্ন, ক্লান্ত ভগ্নোদ্যম, হতোৎসাহ বন্ধু দুজন শুধু মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছে পথের সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় পথ? দূরে— অতিদূরে গম্বুজের মতো কি জানি একটা পদার্থ তাদের সামনে একবার ভেসে উঠেছিল। বড় আশায়, বড় ভরসায় সেই চিহ্ন লক্ষ করে তারা হেঁটে চলেছিল,— কিন্তু হঠাৎ ছায়াবাজির মতো মরীচিকার মতো— সেই গম্বুজও যেন শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারো

সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে, চারিদিকে ঘোলাটে ঘোলাটে ভাব, আকাশে একটা পাতলা মেঘের স্তরও যেন পড়েছে। বাতাসও হয়ে উঠেছে একটু এলোমেলো, চঞ্চল, ঘুরপাক খেতে খেতে মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়া ধুলোবালি উড়িয়ে একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

এখন একটু বিশ্রাম না করলে চলছে না প্রণব, দেহটাকে আর যে টেনে নিয়ে যেতে পারছি না; এরপর যদি মুখ থুবড়ে পড়ি আর হয়তো উঠবার ক্ষমতা থাকবে না। একটা খেজুর গাছের নীচে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশান্ত বললে। প্রশান্তর এই কথার উত্তর না দিয়ে প্রণব হঠাৎ বলে উঠল প্রশান্ত, প্রশান্ত, ঐ বাঁ দিকের খেজুর গাছের ঝোপের আড়াল থেকে একটা তীব্র আলো যেন আমার চোখে পড়ল।

প্রশান্ত কিন্তু কিছুই দেখতে পায় নি। সে নির্বিকারভাবে বললে ভুল, ভুল প্রণব, ওটা গম্বুজের মতোই ছায়াবাজি মাত্র। মরুভূমিতে পথ-হারা যাত্রী যেমন মরীচিকা দেখে উল্লসিত হয়, আমাদের অবস্থাও এখন তাই হয়েছে।

না, না মরীচিকা নয়, ঐ দ্যাখো আবার, আবার সেই আলো— প্রণব ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল। এবার প্রশান্তও বিশেষ লক্ষ করে

দেখল বাস্তবিকই একটা তীব্র আলোর রেশ দূরে ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল করে ফেলেছে।

ওটা কিসের আলো! গভীর কৌতূহলের সঙ্গে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলো।

প্রণব বললে—'আমার মনে হয় কোনো উড়োজাহাজ নেমেছে ওখানে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি এখনই জানা দরকার, শীগ্‌গির চল প্রশান্ত।

আবার ছুটে চলল দুজনে সেই আলো লক্ষ্য করে অসীম উৎসাহে।

* * * *

মানসমোহন নামে একটি বাঙালি যুবক আর জাফর খাঁ নামে একটি পেশোয়ারী মুসলমান আফগানিস্থান থেকে উড়োজাহাজে ভারতবর্ষে ফিরছিল। তারা দুজনেই নূতন এরোপ্লেন চালাতে শিখেছে। হঠাৎ তাদের কল একটু বিগড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাদের একটা মাঠের মধ্যে নামতে হয়েছে। কল ঠিক হয়ে গেছে— এইবার তাদের উড়বার পালা— ঠিক এমনি সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রণব আর প্রশান্ত তাদের কাছে উপস্থিত।

সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে মানসমোহনের আর বিস্ময়ের সীমা নেই। বললে— ভাগ্যিস, ঠিক সময়ে আপনারা এসে পড়েছেন,— আর একটু দেরি হলেই আর আমাদের পেতেন না। আমাদের কল ঠিক হয়ে গেছে,— এক্ষুণি আমরা উড়বার বন্দোবস্ত করছিলাম।

কথায় কথায় মানসমোহন বললে, পরশু দিন আমরা যখন আফগানিস্থানের দিকে যাই, হঠাৎ একটু জলের দরকার হওয়ায় আমরা মাঠের মাঝে আমাদের এরোপ্লেন নামাই। একটা ছোট বাড়ি দেখে সেখানে জলের সন্ধানে যাই। দুজন আফ্রীদি সেখানে ছিল। একজন দেখলাম মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। সে ব্যাটা আমাদের দেখে একটা ছোরা নিয়ে টলতে টলতে তেড়ে এলো। জাফর খাঁ এই দেখে চালালো তার বন্দুক, এক গুলিতেই বোধ হয় গেল লোকটা খতম হয়ে। আমরা তৎক্ষণাৎ এরোপ্লেন ছেড়ে দিলাম।

এইবার ব্যাপারটা জলের মতো প্রণবদের কাছে সোজা হয়ে গেল। তারা এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল কেন সেই আফ্রীদির দল তাদের তাড়া করে এসেছিল। তারা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে যে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল— তার কিছু আগেই যে মানসমোহনরা সেই বাড়িতেই এসেছিল— সে বিষয়ে আর কোনো ভুল নেই। যে লোকটাকে তারা নিহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল সেটাও যে জাফর খাঁরই কীর্তি তাও আর এখন বুঝতে তাদের বাকী রইল না। তাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মানসমোহন আর জাফর খাঁ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

জীবন্ত কঙ্কালটার কথা শুনে জাফর খাঁ বললে— সর্বনাশ, আপনারা তবে পিলপিল্লার খপ্পরেও পড়েছিলেন ?

পিলপিল্লা ? সে আবার কি ? গভীর বিস্ময়ে মানসমোহন জিজ্ঞাসা করলো।

পিলপিল্লা হচ্ছে একটা দুরন্ত উন্মাদ। দেখতে একটা কঙ্কালের মতো,— দুর্দান্ত হিংস্র স্বভাব তার। তাকে ভয় করে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই। কখন কোথায় থাকে, হঠাৎ কোন মুহূর্তে কাকে আক্রমণ করে কিছুই ঠিক নেই, এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।

স্তম্ভিত হয়ে প্রণব, প্রশান্ত আর মানস জাফরের কথাগুলি শুনছিল।

আকাশের কোল দিয়ে উড়োজাহাজ ছুটে চলেছে করাচীর পথে। সেখান থেকে প্রণবরা ট্রেনে কলকাতায় ফিরবে।

প্রণব একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে প্রশান্তকে বললে— আমাদের অভিযান শেষ হল এইখানেই— এতক্ষণ হয়তো প্রভাত আর প্রফুল্ল বর্মার সীমান্ত পেরিয়ে চীনরাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে।



পর্বাত্য ত্রিপুরা রাজ্যের শেষে আরম্ভ হয়েছে বিখ্যাত লুসাই পাহাড়ের শ্রেণী।

সন্ধ্যা হয় হয়— ঠিক এমনি সময়ে প্রভাত আর প্রফুল্ল— এই লুসাই পাহাড়ের কাছে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

সারাদিন তারা ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে পরিশ্রান্ত, আর তা' ছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে আর ভালো করে পথও দেখা যাচ্ছে না। যদিও তাদের সঙ্গে সাইকেলের আলো আর টর্চ বাতি আছে,— তবুও এখন আর এই পাহাড়ী জঙ্গলের পথে এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রভাত বললে— প্রফুল্ল, আমাদের আন্দাজ তো ঠিক হল না। ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগেই আমরা ফুংলু গ্রামে এসে পৌছাব, কিন্তু কোথায় সে গ্রাম?

প্রফুল্ল উত্তর দিল— আমরা পথ ভুল করি নি তো? আগরতলায় যে রকম পথের নির্দেশ পেয়েছিলাম— আমরাও তো সেইভাবেই সাইকেল চালাচ্ছি,— বিকালবেলাই তো আমাদের ফুংলু গ্রামে পৌছবার কথা। কিন্তু এ কোথায় এলাম?

প্রভাত একটু ভেবে বললে— হয়তো পথ ভুলই আমরা করেছি।

বেলা তিনটা আন্দাজ আমরা নদীর ধারে যে দু-মুখো রাস্তাটা পেয়েছিলাম, তারই দক্ষিণ পথে যেতে আমরা হয়তো উত্তরমুখে এসে পড়েছি।

সর্বনাশ, এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ ভুল করাটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার প্রভাত। এখন উপায় ? বিচলিত কণ্ঠে প্রফুল্ল বললে।

সেটা তো আমিও বুঝতে পাচ্ছি প্রফুল্ল। শুধু জঙ্গল হলেও চলত,—দুনিয়ার যত হিংস্র জানোয়ার এই জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করে। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে। আর এখন যে ফিরে আবার ঠিক পথ ধরবো তারও কোনো সম্ভাবনা নেই— কাজেই—প্রভাতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই— ভীষণ একটা শব্দে দু'জনেই হঠাৎ চমকে উঠল।

ওটা কি প্রভাত ? গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলো।

বাঘ! কথাটা উচ্চারণ করতেও প্রভাতের গলা যেন শুকিয়ে আসছিল।

আবার, আবার! ভয়ংকর গর্জনে সমস্ত পাহাড় আর জঙ্গল যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। এবার মনে হোলো গর্জনের শব্দটা যেন একটু কাছে এগিয়ে এসেছে।

প্রভাত চাপা-গলায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললে— আর দেরি করে কাজ নেই প্রফুল্ল, এসো সামনের এই গাছটাতে আমরা চটপট উঠে পড়ি। সাইকেল দুটো গাছের নীচে থাক। আগে নিজেদের প্রাণ বাঁচানো দরকার।

আবার সেই প্রাণ-কাঁপানো বিকট হুঙ্কার। এবার আরো কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে প্রভাত আর প্রফুল্ল সামনের একটা ঝাকড়া গাছে উঠে পড়ল, আর ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড এক বাঘ সাইকেল দুটোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ঝন-ঝনাৎ-ঝন-ঠন-ঠন-টুং-টাং। বাঘটা সাইকেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল দুটো মাটিতে পড়ে গেল। সাইকেল পড়ার শব্দ আর ঘণ্টার ধ্বনি মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল।

হঠাৎ আচমকা শব্দ কানে যেতেই বাঘটা বোধ হয় ঘাবড়ে গেল,—সেও তৎক্ষণাৎ আবার এক লাফে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে— যাক, ব্যাটা ভাগ্যিস্ আমাদের দেখতে পায় নি। ওঃ, কী জাঁদরেল বাঘ ওটা। আমাদের দেখতে পেলে নিশ্চয় ব্যাটা আমাদের তাগ করে লাফ মারতো। এসো হে প্রফুল্ল, আমরা আর একটু উপরে উঠে বসি। বাঘ কিন্তু অনেক উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারে।

প্রভাত আর প্রফুল্ল গাছের অনেকখানি উঁচুতে উঠে বসল আজ রাতটা এখানে বসেই কাটাতে হবে।

দুই

এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়া গেল প্রভাত, কোথায় ফুংলু গ্রামের এক সরাইখানায় দিব্বি নিশ্চিন্তে রাত কাটাব, তা না এই বিপদসঙ্কুল শ্বাপদপূর্ণ জঙ্গলে এসে হাজির হলাম,— ওঃ— অদৃষ্টের কি পরিহাস। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল।

প্রভাত একটা গাছের ডালে ভালো করে হেলান দিয়ে বসে বললে— আজ রাতটা এই ভাবেই বসে কাটিয়ে দিতে হবে প্রফুল্ল,— এ ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় দেখছি না। উঃ, ওই জাঁদরেল কেঁদো বাঘটার হাত থেকে খুব রেহাই পাওয়া গেছে, বাপরে, যেমনি তার আকার তেমনি তার হুঙ্কার।

দুটো রাইফেল তাদের দু'জনের পিঠে বাঁধা।

প্রফুল্ল বললে— টোটা-ভরা রাইফেল আমাদের সঙ্গে আছে। সহজে আমাদের কেউ কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ওটা তোমার মস্ত ভুল প্রফুল্ল। সামনা-সামনি কোনো জন্তু তেড়ে এলে না হয় তাকে গুলি করবার সময় পাব, কিন্তু কোন দুর্দান্ত জন্তু কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে— সম্পূর্ণ

আমাদের অজান্তে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে— তা' কে বলতে পারে। সর্বদা আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। এদিককার জঙ্গল অতি মারাত্মক। প্রভাত এই কথা বলে তার বেল্ট থেকে টর্চ বাতিটা খুলে হাতে করে বসল।

উঃ কি কামড়াচ্ছে প্রভাত, শীগ্‌গির বাতিটা জ্বালো, হাঁটুর এ জায়গাটা ভীষণ জ্বলছে—

প্রফুল্লের কথা শোনামাত্র প্রভাত খুট করে বাতিটা জ্বেলে ফেলল— আরে সর্বনাশ, এদিকে সরে এসে বোসো প্রফুল্ল— একেবারে যে পিঁপড়ের ডিপোর মধ্যে বসে আছো।

প্রফুল্ল টর্চের আলোতে দেখতে পেল অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপড়ে বেপরোয়াভাবে তার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে অন্য একটা ডালে এসে বসল। ওঃ, তার হাঁটুটা এখনো ভীষণভাবে জ্বলছে,— ফুলেও উঠেছে অনেকখানি; কি ভয়ংকর বিষাক্ত পিঁপড়ে ওগুলি! দু'জনে দুটি ডালে হেলান দিয়ে বসেছে। এইভাবেই আজ রাত কাটাতে হবে!

প্রভাত বললে, আবার ঘুমিয়ে পড়ো না যেন প্রফুল্ল, তা হলেই ঝুপ করে নীচে পড়ে যাবে। নীচে পড়ে গেলে আর রক্ষা থাকবে না কিন্তু!

প্রফুল্ল বললে বাপরে— এত উঁচু থেকে পড়লে হাত-পা ভেঙে যে চুর-মার হয়ে যাবো—

তাকে বাধা দিয়ে প্রভাত বললে— শুধু হাত-পা যদি ভাঙতো কথাই ছিল না। আমি ভাবছি অন্য কথা। হাত-পা ভাঙবার আগেই সবশুদ্ধ হয়তো কোনো রাক্ষুসে জীবের পেটের ভিতরই চলে যেতে পারো। দেখলে না কিছুক্ষণ আগে অপরূপ, স্ফূর্তিবাজ মূর্তিখানি কায়দায় পেলে ওকি আর তোমার আমার মতো মানুষকে গিলে ফেলতে পারে না?

আরে ওটা কি প্রভাত! ঐ দ্যাখো দূরে টর্চের বাতি দেখা যাচ্ছে।



নিশ্চয় দু'জন লোক দুটো বাতি জ্বেলে এই দিকে আসছে, আর আমাদের ভাবনা নেই— প্রফুল্ল উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

প্রভাত লক্ষ্য করে দেখল বাস্তবিকই কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে দুটো আলোর মতো কি জিনিস যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। প্রভাত আর প্রফুল্ল দুজনেই একসঙ্গে টর্চ জ্বেলে ঐ ঝোপ লক্ষ্য করে আলো ফেলল।

ওরে সর্বনাশ! প্রভাত আর প্রফুল্ল দু'জনেই একসঙ্গে শিউরে উঠল।

টর্চের তীব্র আলো ঝোপের উপর পড়তেই তারা দেখল প্রকাণ্ড এক বাঘ পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে।

টর্চের আলো মুখে পড়তেই বাঘটা আচমকা ভয় পেয়ে ভীষণ হালুম করে ভয়ংকর এক লাফ দিয়ে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত গম্ভীর হয়ে বললে— ছাখো প্রফুল্ল, আমরা এই বনে এসেছি, — এ খবরটা জানোয়ার-রাজ্যে রটে গেছে। আমরা যেমন দূর থেকে বাঘের কিংবা বুনো জানোয়ারের গন্ধ পাই, মানুষের গন্ধও তেমনি জানোয়ারদের নাকে যায়— আর তাদের জিভ দিয়ে লাল ঝরতে থাকে। কাজেই খুব সাবধান! আবার আমি বলছি, যে কোনো মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়তে পারি। আমার মনে হচ্ছে, যে বাঘটা প্রথম আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, সেটাই আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই টুঁটি টিপে ধরবে।

রোসো প্রভাত, আমরা যে সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও অস্ত্রহীন নই, সে কথা জানোয়ার-রাজ্যে একবার ভালো করে জানিয়ে দিই। এই বলে প্রফুল্ল তার রাইফেলটা তুলে ধরে শূন্যে একবার গুলি ছুঁড়ল।

বন্দুকের শব্দে সমস্ত পাহাড় আর বন গমগম করে উঠল।

তিন

রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল। পাছে ঘুমিয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় প্রভাত আর প্রফুল্ল নানারকম গল্প ফেঁদে বসেছে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চোখের পাতা কে যেন জোর করে চেপে ধরছে— নিজেদের অজান্তেই নিজেরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রভাত বললে, প্রফুল্ল, অর্ধেকটা রাত আমরা কাটিয়ে দিয়েছি, আর বাকী রাতটুকু কোনো রকমে জেগে কাটাতে পারলেই বাঁচা যায়।

প্রফুল্ল এর উত্তরে যেন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। হঠাৎ গাছটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল।

এ কি ভূমিকম্প নাকি ? ভাগ্যিস হাতের কাছে এই ডালটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে হয়েছিল আর কি। এক্ষুণি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যেতাম। প্রফুল্ল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে।

গাছটা তখনো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

প্রভাত বললে, ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না প্রফুল্ল, দাঁড়াও একবার দেখি! এই বলে সে টর্চের আলো নীচের দিকে ফেলল।

হাতি, হাতি, একটা মস্ত হাতি বড় আরামে গাছের গুঁড়িতে পিঠ চুলকাচ্ছে। তাতেই এই বিপর্যয় কাণ্ড। প্রভাত চাপা গলায় বললে।

ওঃ সর্বনাশ, গাছের থেকে একবার হড়কে পড়লেই হয়েছিল আর কি। একেবারে বুনো হাতির খপ্পরে। উঃ—ভাগ্যিস সামনের এই ডালটা ধরে ফেলেছিলাম। কাঁপতে কাঁপতে প্রফুল্ল উত্তর দিল।

তীব্র টর্চের আলো মুখের উপর পড়তেই হাতিটা শুঁড় তুলে অবাক হয়ে একবার উপরের দিকে তাকাল— তারপর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তিনগুণ জোরে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঘষতে লাগল।

আরে এ যে বেজায় উৎপাত শুরু করে দিল প্রভাত, গাছের উপর

এক রকমভাবে জবুথুবু হয়ে কষ্ট করে বসে আছি,— তাও ব্যাটার যেন সহ্য হচ্ছে না। দেব নাকি ব্যাটার মাথাটা ফুটো করে রাইফেলের গুলিতে। উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্ল বললে।

প্রভাত গাছের ডালটা ভালো করে আঁকড়ে ধরে বললে, না হে প্রফুল্ল এভাবে টোটা আর নষ্ট কোরো না,— যে জায়গায় আমরা এসে পড়েছি, তাতে যথেষ্ট টোটা আমাদের সঙ্গে মজুত থাকা দরকার। নেহাত আত্মরক্ষা করা ছাড়া অন্যভাবে আর গুলি নষ্ট করে কাজ নেই।

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে বললে জানোয়ারটা যে ভাবে আরামে পিঠ চুলকাচ্ছে তাতে ব্যাটা যে শীগ্‌গির এখান থেকে নড়বে তা মনে হচ্ছে না। এদিকে যে আর স্থিরভাবে বসে থাকাও কষ্টকর ব্যাপার। কখন যে হাত হড়কে নীচে পড়ে যাই বলা যায় না।

একটু ভেবে নিয়ে প্রভাত বললে দাঁড়াও, এক কাজ করা যাক, দুজনে মিলে আমরা চিৎকার জুড়ে দেই, আর মাঝে মাঝে টর্চের আলো হাতিটার মুখের উপর ফেলি। দেখি ওষুধ ধরে কিনা!

হৈ হৈ— হো-হো হোয়াক্ হোয়াক্ হু-হুর— হো— হুম-হুম-হো—

প্রভাত আর প্রফুল্ল দুজনে মিলে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল,— আর খুট খুট করে মাঝে মাঝে টর্চের আলো হাতিটার মুখের উপর ফেলতে লাগল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে হাতিটা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, দিব্বি আরামে সে পিঠ ঘষছিল। হঠাৎ বিকট চিৎকার শুনে আর আলোর ঝিলিক দেখে হাতিটা বোধ হয় ভয় পেল। সে আরামের পিঠ চুলকান ছেড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

প্রভাত হাসতে হাসতে বললে— ফন্দিটা এত সহজেই ফলে যাবে ভাবতে পারি নি। ভাগ্যিস্ বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল।

প্রফুল্ল আবার বেশ ভালো করে ডালের উপর গদীয়ান হয়ে বসে বললে তোমার বুদ্ধিকে বিশ্বাস করি বলেই এখন পর্যন্ত উৎসাহে ভাটা পড়ে নি। দারুণ সংকটের মধ্যেও খুব বেশি বিচলিত হই না। তোমার

বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, ধৈর্য আছে, সংযম আছে,— আর সকলের উপরে আছে আত্মবিশ্বাস,— সেটা ভালোভাবে জানি বলেই এই দুঃসাহসিক অভিযানে তোমার সঙ্গে বের হয়েছি।

আত্ম-প্রশংসায় সংকুচিত হয়ে প্রভাত বললে— ও সব বাজে কথা থাক প্রফুল্ল, দ্যাখো তো তোমার হাতঘড়িতে কটা বেজেছে,— আমার ঘড়িটা হঠাৎ কেন জানি বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রফুল্ল টর্চের আলোতে তার ঘড়িটা দেখে বললে— রাত ৪টা বেজে ২৭ মিনিট হয়েছে।

আর এক ঘন্টা কোনো রকমে কাটাতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ছয়টা বাজবার আগেই দিনের আলো ফুটে উঠবে। আমরা তখন স্বচ্ছন্দে গাছ থেকে নামতে পারবো। প্রভাত বললে।

চার

চারিধারে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পাখিদের কূজন-কোলাহলে সমস্ত বন মুখরিত।

তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামতে গিয়ে প্রফুল্ল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল— প্রভাত, সর্বনাশ, নামব কি করে?

কেন কি হল প্রফুল্ল, গাছের গুঁড়িটা বেয়ে নেমে পড়ো চটপট। ডাল ধরে নীচের দিকে নামতে নামতে প্রভাত বললে।

গাছের গুঁড়ি বেয়ে নামতে গেলে প্রাণের মায়াটি ছাড়তে হয়। ঐ দ্যাখো গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে মস্ত এক সাপ। বোধ হয় অজগর। বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে প্রফুল্ল বলল। বুক তার তখনো ঢিপঢিপ করছে।

এ্যাঁ, বল কি প্রফুল্ল! পাতার আড়াল সরিয়ে গুঁড়ির দিকে চেয়ে প্রভাত চমকে উঠল। উঃ, কি রাক্ষুসে সাপ। গাছের গুঁড়িটা ধরে ঐ দ্যাখো মিট মিট করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

আমি তো প্রথমে ওটাকে সাপ বলে চিনতেই পারি নি। গাছের শিকড় ভেবে ওর গায়ে পা দিয়েছিলাম আর কি! ভাগ্যিস্ হঠাৎ ওর মুখটা আমার নজরে পড়েছিল। ভীতকণ্ঠে প্রফুল্ল উত্তর দিল।

গাছের গুঁড়ি বেয়ে আর নামা চলবে না। প্রভাত বললে— এসো এক কাজ করা যাক। ডাল ধরে আমরা ঝুলে নেমে পড়ি। সাপটা যেভাবে আমাদের দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে মিট মিট করে তাকাচ্ছে— হঠাৎ আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়। তা হলে কিন্তু অবস্থা হবে অতি সংকটজনক।

এই বলে প্রভাত একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল, তারপর দিল এক লাফ। প্রফুল্লও তাকে অনুসরণ করলো।

হঠাৎ শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে সাপটা যেন একটু ক্ষুব্ধ হল, সে মুখ ঘুরিয়ে বারে বারে নীচের দিকে প্রভাত আর প্রফুল্লের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগল আর তার লকলকে জিভ বের করতে লাগল।

সাইকেল দুটো একটু দূরে মাটির উপর পড়েছিল।

প্রভাত বললে— আর দেরি করা উচিত নয়, চলো, তাড়াতাড়ি আমরা এবার ফিরে গিয়ে ঠিক পথ ধরি; ফুংলু গ্রাম পেলে আমরা আসল পথ ধরতে পারবো।

সাইকেলের কাছে এসে প্রভাত আর প্রফুল্লের তো চক্ষুস্থির। সাইকেল দুটো তুবড়ে তুমড়ে একাকার, একেবারে অচল।

এই দৃশ্য দেখে প্রফুল্ল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল— একি হল প্রভাত, সাইকেলগুলির এ দুর্দশা করলো কে? বাঘটা কাল রাত্রে সাইকেল দুটোর উপর যখন লাফিয়ে পড়েছিল, তখনই বোধ হয় এই কাণ্ড ঘটেছে।

প্রভাত বললে— বাঘের চাপে সাইকেল দুটো এমন তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, কালকের বুনো হাতিটার কীর্তি এটা। গাছের গুঁড়িতে যখন ব্যাটা পিঠ চুলকাচ্ছিল তখনই এই

কাণ্ড করে থাকবে। দেখছো না— সাইকেলগুলো কেমন থেঁতলে দিয়েছে পায়ের চাপে।

এখন উপায়, প্রভাত, সাইকেলের ভরসাতেই পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম,— এখন বাধ্য হয়েই সে সংকল্প ত্যাগ করতে হবে, পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাওয়া যায়। নিরাশ হয়ে এই কথাগুলি প্রফুল্ল বললে :

আমাদের আবার নূতন সাইকেল যোগাড় করতে হবে, এই পৃথিবী ভ্রমণের সংকল্প আর ত্যাগ করা যায় না। এখন হঠাৎ এ অবস্থায় দেশে ফিরে গেলে বিশেষ লজ্জার কথা হবে প্রফুল্ল। চলো আপাতত পায়ে হেঁটেই ফুংলু গ্রামের দিকে যাই। প্রভাত গম্ভীর হয়ে বললে।

দরকারী জিনিস-পত্র যা সাইকেলে বাঁধা ছিল, হাতির পায়ের চাপে তাদের দুর্দশার একশেষ। খাবার-দাবারগুলিও বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে।

জিনিসগুলি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে প্রফুল্লের আর দুঃখের শেষ নেই।

প্রভাত বললে, যা গেছে, তার জন্যে আর কোনো দুঃখ করে লাভ নেই প্রফুল্ল,— এখন চলো তাড়াতাড়ি এই বিঘ্নসঙ্কুল বন থেকে প্রাণে প্রাণে সরে পড়ি। সাইকেল যখন নেই, তখন বিপদে পড়লে তাড়াতাড়ি পালাতেও পারবো না। সম্বল আমাদের এখন রাইফেল দুটো, টর্চ আর বেল্টে-বাঁধা কিছু কিছু জিনিস।

প্রভাত যেই পথ চলতে যাবে, পিছন থেকে তার হাত ধরে থামিয়ে প্রফুল্ল বললে, ঐ দ্যাখো ঝোপের আড়ালে ঠিক আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে কে ?

মস্ত এক বুনো মোষ লাল-লাল চোখে শিং বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে, আর মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছে।

মোষটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রভাত হাততালি দিয়ে 'হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠল— আর সঙ্গে সঙ্গে মোষটা খাঁড়ার মতো

শিং নীচু করে আগুনের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঝড়ের মতো তেড়ে গেল প্রভাত আর প্রফুল্লের দিকে।

প্রভাত আর প্রফুল্ল প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল জঙ্গলের দিকে।

পাঁচ

ফিরে দাঁড়িয়ে যে মোষটাকে গুলি করবে সে অবসরটুকুও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রভাত তেমনিভাবে ছুটতে ছুটতে একবার ফিরে তাকাল, তারপর আরো দ্বিগুণ বেগে ছুটতে শুরু করে দিয়ে প্রফুল্লকে বলল— আরো জোরে দৌড়াও প্রফুল্ল, একটা নয়,— একপাল মোষ আমাদের তাড়া করেছে।

এভাবে দৌড়ে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো না,— প্রায় আমাদের ধরে ফেললে বলে। এসো, আমরা সামনের ঐ পাথরগুলোর আড়ালে নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দেই।

প্রফুল্লর যুক্তিটা মন্দ নয়। প্রভাত বললে তাই চলো প্রফুল্ল, মস্ত মস্ত নলগাছের ঝোপ রয়েছে সামনে, ওর ভিতরে ঢুকে পড়লে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়।

কিছু দূরেই একটা ছোট পাহাড়ের ধারে ঘন নল-খাগড়ার জঙ্গল। এক একটা গাছ দুই তিন মানুষের সমান উঁচু।

প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দুই বন্ধু সেই ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। প্রফুল্ল বললে— এইবার একবার এখান থেকে গুলি ছুঁড়ি মোষের পালকে লক্ষ্য করে।

প্রভাত বাধা দিয়ে বলল— না-না, প্রফুল্ল ওকাজ করতে যেও না। আমাদের এখন আর ওরা খুঁজে পাবে না। ঐ ছাখো, ওরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। মিছামিছি আর ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। যদি কোনো রকমে টের পায় আমরা এই ঝোপের মধ্যে এসে লুকিয়েছি,

তবে কিন্তু আবার আক্রমণ করবে। সকলে মিলে এই নল-খাগড়ার বন লণ্ডভণ্ড করে আমাদের তালাস করবে। বাঘের চেয়েও ওরা দুর্দান্ত, সাপের চেয়েও ওরা হিংস্র। কাজেই ওদের এখন নির্বিঘ্নে চলে যেতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মোষের পাল বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রভাত আর প্রফুল্ল ঝোপ থেকে বের হয়ে এলো।

তাদের সারা গায়ে তখনো দরদর করে ঘাম ঝরছে। প্রবল উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

প্রফুল্ল বললে— এইবার ফিরে চলো প্রভাত, আর দেরি করে কাজ নেই। এই জঙ্গলের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়।

তাই তো আমিও ভাবছি প্রফুল্ল! কিন্তু ফিরবো কোথায়! এতক্ষণ প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে কোথায় যে এসে পড়েছি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। চারিধারেই ঘোর জঙ্গল, অগণন পাহাড়ের শ্রেণী। কোন্‌টা যে পথ, কোন্‌টা বিপথ, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছি না। এমন কি আমরা কোন্ দিক থেকে যে ছুটে এসেছি সেটাও আন্দাজ করতে পারছি না। তুমি কিছু বুঝতে পারছো প্রফুল্ল? প্রভাত চিন্তিত হয়ে বললে।

প্রফুল্ল নির্বাক, নিস্তব্ধ। সেও দিশেহারা হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে সে প্রভাতের মুখের দিকে ছেলেমানুষের মতো তাকিয়ে রইল।

প্রভাত বললে— এত সহজেই হতাশ হয়ে গেলে চলবে না। এসো, এক কাজ করা যাক। উঁচু একটা গাছে উঠে চারিধারে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখি যদি পথের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়।

তুমি নীচে দাঁড়াও, আমি ঐ উঁচু শালগাছটায় উঠে একবার দেখি— কিছু ঠাহর করা যায় কি না। এই বলে প্রফুল্ল সামনের একটা শালগাছে উঠতে লাগল।

কি দেখছো প্রফুল্ল! নীচের থেকে প্রভাত চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো।

ততক্ষণ প্রফুল্ল গাছের একেবারে আগডালে উঠে বসেছে। সেও

চিৎকার করে উত্তর দিল— চারিধারে খালি বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন। এইটুকু বলেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আবার বলে উঠল— প্রভাত, প্রভাত, ঐ যে, ঐ যে— অনেক দূরে,— একটা পাহাড়ের নীচে একটা গ্রামের মতো কি জানি দেখা যাচ্ছে।

প্রভাত গাছের নীচে থেকে জিজ্ঞাসা করলো— কোন্ দিকে? পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এর কোন্ দিকে গ্রামখানা দেখতে পাচ্ছ!

তা হলেই তো মুশকিল, তা কি করে বলি প্রভাত,— কোন্‌টা যে কোন্ দিক, কিছুই ধরতে পারছি না। প্রফুল্ল উত্তর দিল।

দিক ঠিক করতে না পারলে ওদিকে এগুবে কি করে, আন্দাজে? আচ্ছা, সূর্য এখনো আকাশে বেশি দূর ওঠে নি— ঠিক করে ছাখো দেখি, যে দিকে সূর্য আছে তার কোন্ দিকে গ্রামখানি বলে মনে হচ্ছে। প্রভাত চেঁচিয়ে বললে।

প্রফুল্ল ভালো করে চারিধারে তাকিয়ে দেখে আবার বললে— যে দিকে সূর্য— গ্রামখানি সেই দিকেই বলে মনে হচ্ছে।

—তবে বোঝা গেল গ্রামখানি পূব দিকে। নেমে এসো এবার প্রফুল্ল। ঐ সূর্যই হচ্ছে এখন আমাদের দিক্-নির্ণয় যন্ত্র। প্রভাত বলে উঠল।

ছয়

আকাশের গায়ে সূর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ততক্ষণ প্রভাত আর প্রফুল্ল পথ চলছিল। দুরারোহ পাহাড়ের ধার দিয়ে নিবিড় দুর্গম পথ। ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলা দুরূহ কষ্টকর ব্যাপার। তবুও তারা কোনো রকমে এতক্ষণ হেঁটে চলছিল লোকালয়ের আশায়।

কিন্তু হায় হায় এ আবার কি হল! প্রভাত বলে উঠল— ছাখো তো প্রফুল্ল, কি মুশকিলের ব্যাপার, আকাশটা যে ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। যে সূর্যকে লক্ষ্য করে আমরা এতক্ষণ দিক ঠিক করেছিলাম সেই সূর্যই

যে গেল মেঘের তলায় তলিয়ে। এখন কোন্‌টা পূর্ব, কোন্‌টা দক্ষিণ ধরবার কোনো উপায় নেই।

আমিও তো সেই কথা ভেবেই অস্থির হয়ে যাচ্ছি প্রভাত। যে কোনো প্রকারেই হোক তাড়াতাড়ি এই বাঘা-জঙ্গল থেকে না বেরুতে পারলে আর উপায় নেই। আমি কিন্তু আবার বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। প্রফুল্ল উদ্বেগের সঙ্গে বললে।

রাইফেলটা প্রস্তুত করে রাখ প্রফুল্ল, ঐ ছ্যাখো সামনের ঝোপটা মনে হচ্ছে যেন একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে—

প্রভাতের কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ কী একটা জানোয়ার সামনের ঝোপটা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

চোখের নিমেষে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে প্রফুল্ল সেই জানোয়ারটাকে গুলি করতে গেছে, হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে প্রভাত বললে— বাঘ নয় প্রফুল্ল, শূয়োর, বন-বরাহ, ওকে আর মেরে কাজ নেই।' ঐ ছ্যাখো, হঠাৎ সামনে আমাদের দেখতে পেয়ে ভয়ে ও খুর্‌ খুর্‌ করে পালাচ্ছে।

রাইফেলটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে প্রফুল্ল বললে— এখন কি করবে প্রভাত! আমি তো কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। কালো কালো মেঘের স্তরে সারা আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এলো। বৃষ্টি আসন্ন।

প্রভাত বললে— জোর বৃষ্টি আসছে প্রফুল্ল। ঠায় ভিজে মরতে হবে দেখছি। কোথাও গিয়ে যে একটু আশ্রয় নেব তারও উপায় নেই। এই পর্যন্ত বলেই প্রভাত একটু ঝুঁকে পড়ে পাশে কী যেন দেখল, তারপর বলে উঠল— বুনো-জন্তুদের চলাফেরার একটা পথ দেখতে পেয়েছি প্রফুল্ল। এসো এখন তাড়াতাড়ি সেই পথ ধরে যতটা পারা যায় এগিয়ে যাওয়া যাক।

প্রভাত আর প্রফুল্ল হনহন করে সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এগিয়ে চলল। এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে। চারিধারে ঝরাপাতার শব্দ হচ্ছে 'ঝর-ঝর, মর-মর।'

প্রভাত বললে— চারিধারে এত শব্দ হচ্ছে যে— বুনো-জন্তুরা আমাদের আশে-পাশে কোথায় যে ঝোপে-ঝাড়ে চলাফেরা করছে কিছুই ধরতে পারা যাবে না। তাদের চলাফেরার শব্দ আমাদের কানে আসবে না এখন। কোথায় কখন যে অতর্কিতে আক্রমণ করবে আমরা টেরই হয়তো পাবো না—

প্রভাতের কথা শেষ হতে না হতে শুরু হল ঝমাঝম বৃষ্টি। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মতো এসে শরীরে বিঁধতে লাগল।

প্রফুল্ল শশব্যস্ত হয়ে উঠল— জামা-কাপড়গুলো যে ভিজে যাচ্ছে প্রভাত, মহা মুশকিলের কথা—

প্রভাত বললে—জামা-কাপড়গুলির জন্যে আমি মোটেই ভাবছি না, আমার ভয় হচ্ছে অন্য কারণে। এই বৃষ্টিতে যদি রাইফেলের টোটাগুলি ভিজে যায় তবেই হবে ঘোর ফ্যাসাদ। এই বিপদ-বহুল-শ্বাপদ-সংকুল জঙ্গলে রাইফেল দুটোই আমাদের একমাত্র ভরসা। যে কোনো প্রকারেই হোক টোটাগুলিকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। ঐ যে কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে কতকগুলি পাথরের স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। চলো যদি ওর আড়ালে কোন রকমে আশ্রয় পাওয়া যায়। এই বলেই প্রভাত এক রকম প্রায় ছুটে চলল সেই পাথরগুলির দিকে। প্রফুল্ল প্রভাতের পিছনে পিছনে দৌড় লাগাল।

মস্ত ঝাঁকড়া গাছ— বড় বড় চ্যাটালো পাতা তার। এই পাতা ভেদ করে বৃষ্টির ধারা সহজে নীচে নেমে আসতে পারছে না।

যা হোক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একটা পাথর দুটো পাথরের উপর এমন ভাবে রয়েছে, যে হাঁটু গেড়ে তার নীচে বেশ বসা চলে।

এইবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গাছের পাতাগুলো যে রকম বড় বড় আর চ্যাটালো, সহজে আমাদের আর বিশেষ ভিজতে হবে বলে মনে হয় না। যদি এই পাতা ভেদ করেও বৃষ্টি নামে, তবুও আমাদের এখন বিশেষ কোনো ভাবনার কারণ নেই। ঐ পাথরটার তলায় আমরা হামাগুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে বসতে পারবো কিছুক্ষণ। টোটাগুলি ভিজবার

আর ভয় নেই এখন। এই বলে প্রভাত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বৃষ্টি ঝরে পড়ছে মুষলধারে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া।

সাত

কড়-কড়-কড়-কড়াৎ—

অদূরে জঙ্গলের মধ্যে ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ল। প্রভাত আর প্রফুল্ল দু'জনেই ভীষণ রকম চমকে উঠল এই বাজের আতঙ্কর শব্দে।

উঃ, কী ভয়ংকর শব্দ, কানের পর্দা ফেটে যাবার যোগাড়,— এইটুকু বলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রফুল্ল আবার বলে উঠল— ঐ ছাখো প্রভাত, মস্ত এক হাতি পাহাড়ের উপর থেকে ঝড়ের মতো নেমে আসছে আমাদের দিকে শুঁড় তুলে।

চকিতের মধ্যে সেই দিকে তাকিয়ে প্রভাত বলে উঠল— সাবধান প্রফুল্ল, রাইফেলটা ঠিক করে বাগিয়ে ধরো— হাতিটা বোধ হয় আচমকা বাজের শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে এদিকেই আসছে। আরে সর্বনাশ! প্রফুল্ল আর রক্ষা নেই, শুধু একা নয়, একা নয়, ঐ ছাখো তার পিছনে আসছে আরো ছোট বড় অগুনতি হাতি।

এসো আমরা তাড়াতাড়ি এই গাছটায় উঠে আত্মরক্ষা করি, রাই-ফেলের গুলিতে আমরা এতগুলি হাতির বিশেষ কিছুই করতে পারবো না, শুধু ক্ষেপিয়ে তুলবো মাত্র। এসো, চটপট আমরা এই গাছটায় উঠে পড়ি— এই বলে প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে গেল।

কিন্তু এ গাছে ওঠা সহজ কথা নয়। নীচে ডালপালা এমন কিছুই নেই যে তাই ধরে উপরে ওঠা যায়— তার উপর বৃষ্টির জলে গাছের গুঁড়িটা হয়েছে ভয়ানক পিছল। খানিকটা উপরে উঠে প্রফুল্ল হড়কে আবার নীচে পড়ে গেল।

ওদিকে হাতির পাল প্রায় এসে পড়েছে।

আর উপায় নেই প্রফুল্ল,— এই বৃষ্টির মধ্যে এখন ছুটে পালানোও অসম্ভব ; গাছেও চট করে উঠতে পারা যাবে না। চলো ঐ পাথরটার আড়ালে ঐখান থেকে আমরা ওদের তাগ করে গুলি চালাই,— এ ছাড়া এখন অন্য কোনো পন্থা দেখতে পাচ্ছি না।

সেই পাথরগুলোর পাশে একটা সুবিধা মতো জায়গায় দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল।

সামনের হাতিটা ছুটতে ছুটতে এসে কিছু দূরে থমকে দাঁড়াল ; তারপর শুঁড় তুলে তার কুৎকুতে চোখ মেলে দুই বন্ধুকে একবার ভালো করে দেখে নিল, তারপর একবার বিকট গর্জন করে তেড়ে এলো প্রভাতদের দিকে,— তার পিছনে পিছনে ছুটে আসতে লাগল সেই মত্ত হাতির পাল।

চালাও গুলি প্রফুল্ল, সামনের হাতিটার কপাল লক্ষ্য করে— এই বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতও গুলি চালাল।

দুরুম— দু-উ-ম— দুরুম দু-উ-ম।

প্রভাত আর প্রফুল্লের অব্যর্থ হাতের সন্ধানে রাইফেলের গুলি ছুটে গিয়ে লাগল প্রথম হাতিটার কপালে! আচম্বিতে আহত হয়ে হাতিটা মুখ থুবড়ে একবার মাটিতে বসে পড়ল, তারপর আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ভীমগর্জনে প্রবলবেগে আক্রমণ করল প্রভাত আর প্রফুল্লকে। পিছনের হাতির পাল থমকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তারা আর এগোতে ভরসা পেল না।

এর ভিতর দুই বন্ধু আবার রাইফেলে গুলি ভরে নিয়েছে।

আহত ক্ষিপ্ত হাতিটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আবার ভয়ংকরভাবে তেড়ে আসতে লাগল,— আবার দুই বন্ধু যেই গুলি চালাতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে ঘটল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

পাশের এক ঝোপ থেকে অতর্কিতে প্রকাণ্ড এক বাঘ প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে পড়ল সেই আহত হাতিটার ঘাড়ের উপর!

এই দৃশ্য দেখে পিছনের হাতির পাল গাছপালা ভেঙে হুড়মুড় করতে করতে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

বাঘ হাতিতে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেছে। দুজনের তর্জনে গর্জনে চার-ধার বারে বারে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

প্রভাত বললে, প্রফুল্ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখা উপভোগ্য হলেও মোটেই নিরাপদ নয়। বৃষ্টিটাও অনেক ধরে এসেছে। চলো আমরা এখন মানে মানে সরে পড়ি।

প্রফুল্ল উত্তর দিল, কিন্তু সরে পড়বো কোথায় প্রভাত ; অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। এই বনের সর্বত্রই যে আমাদের কাছে সমান। ঐ ছাখো, জানোয়ার দুটো যুদ্ধ করতে করতে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। এখন আর ভয় নাই। বৃষ্টিটা একেবারে থামুক তারপর না হয় পথের খোঁজ করা যাবে। ততক্ষণ এই পাথরটার উপর একটু বসে বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

পালাও, পালাও প্রফুল্ল, আর বিশ্রাম করবার সময় নেই, ঐ ছাখো সেই আহত হাতিটা আবার তেড়ে আসছে আমাদের দিকে। বোধ হয় বাঘটাকে ও ঘায়েল করে আবার তেড়ে আসছে পূর্বের প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

প্রভাত আর প্রফুল্ল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল।

আট

বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু ঝড় চলেছে পুরোদমে। ঝড়ো-হাওয়ার তাণ্ডব নৃত্যে বনের সমস্ত গাছপালা প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে।

ভিজে স্যাৎস্যাতে পিছল পাহাড়ী পথ। সেই পথ ধরে সমানভাবে ছুটে চলেছে প্রভাত আর প্রফুল্ল,— পিছনে শুঁড় তুলে ছুটে আসছে সেই দুর্দান্ত মত্ত হাতিটা রাগে গর্জন করতে করতে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ প্রফুল্ল চিৎকার করে উঠল প্রভাত, গেলাম, গেলাম, আমি পা হড়কে মাটিতে পড়ে গেছি।

প্রভাত আগে আগে ছুটে চলেছিল হঠাৎ প্রফুল্লের চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল। যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে তার হৃৎপিণ্ডসুদ্ধ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

প্রফুল্ল মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে, একদিকে ছিটকে পড়েছে তার রাইফেলটা, আর ওদিকে যমদূতের মতো তেড়ে আসছে সেই হাতিটা।

হায়, হায়, প্রফুল্লকে বুঝি আর রক্ষা করা গেল না। এক্ষুণি ঐ রাক্ষুসে শয়তান হাতিটা পায়ের চাপে প্রফুল্লকে পিষে ফেলবে।

চকিতের মধ্যে প্রভাত স্থির হয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল মরিয়া হয়ে। সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে প্রফুল্লকে বাঁচানো যায় কিনা।

দুরু-উ-উ-ম প্রভাত হাতিটাকে লক্ষ্য করে আর একবার গুলি চালালো। গুলিটা বিদ্যুতের মতো ছুটে হাতির শুঁড়ে লাগল।

প্রফুল্লকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে হাতিটা রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে প্রবলবেগে ছুটে আসছিল, হঠাৎ বন্দুকের গুলি খেয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আতঙ্কর আর্তনাদ করতে করতে গভীর বনে গা ঢাকা দিল।

প্রফুল্ল মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতই হয়েছিল, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ঐ রাক্ষুসে জন্তুটার হাত থেকে যে এভাবে রেহাই পাবে এ সে ধারণাও করতে পারেনি।

এক দৌড়ে তার কাছে ছুটে এসে প্রভাত হাত ধরে প্রফুল্লকে টেনে তুলে বললে— ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, প্রফুল্ল, তোমাকে আমি এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবো এ আশা করতে পারি নি।

প্রফুল্লের হাঁটুর কাছটা অনেকখানি ছড়ে গেছিল, হাতের কব্জিতেও বেশ চোট পেয়েছে। ছিটকে-পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে সে বললে— এ যাত্রা যে রক্ষা পাবো সে আশা করতে পারিনি প্রভাত। আজ বরাত জোরে রক্ষা পেয়ে গেছি। ভাগ্যিস্, তুমি হাতিটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলে। এ অবস্থায় আমি পড়লে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি ঠিক

থাকতো কিনা সন্দেহ। গুলি চালাবার বুদ্ধি হয়তো আমার মগজেই আসতো না!

যা হবার তা' হয়ে গেছে, এখন চলো প্রফুল্ল বনের থেকে তাড়াতাড়ি বের হবার চেষ্টা করি,— এই রকম দিশেহারা হয়ে আর কতক্ষণ ঘুরে বেড়াব। পৃথিবী ভ্রমণের সংকল্প ত্যাগ করে এখন চলো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

প্রভাতের কথা শুনে প্রফুল্ল বললে— আমি এক্ষুনি ঘরে ফিরে যেতে রাজি প্রভাত, কাজ নেই আর পৃথিবী ভ্রমণে। পৃথিবী ভ্রমণ করা দূরে থাক, এখন প্রাণটি নিয়ে ঘরে যাওয়াই দেখছি দায় হয়ে উঠেছে।

ঠিক বলেছ প্রফুল্ল, কোথায় যাব, কি করবো, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না। সূর্য না উঠলে আর দিকও ঠিক করতে পারছি না। নৈরাশ্যের সুরে প্রভাত বললে।

যে রকম ঝড় চলছে, মনে হয় শীগ্‌গিরই মেঘ কেটে যাবে। প্রফুল্ল আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে।

আমারও তাই মনে হয়। যতক্ষণ সূর্য না ওঠে, এসো আমরা ততক্ষণ সুবিধা মতো জায়গায় অপেক্ষা করি। এই বলে প্রভাত আশে-পাশে তাকাতে লাগল কোনো সুবিধাজনক জায়গা দেখতে পাওয়া যায় কি না।

একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দুজন দাঁড়িয়ে। ঝড়ের বেগে বাঁশঝাড়গুলি ভীষণ রকম হেলছে দুলছে, আর শোঁ শোঁ করে শব্দ করছে।

হঠাৎ প্রভাত চমকে লাফিয়ে উঠল। উপরের বাঁশঝাড় থেকে কী যেন একটা জিনিস তার ঘাড়ে পড়েছে। জিনিসটা মাটিতে পড়তেই দুজনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল— সাপ, সাপ।

ওরে সর্বনাশ! একটা কালো কুচকুচে সাপ মাটিতে পড়েই কিলবিল করতে করতে পালাতে লাগল।

কি সাপ ওটা? প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলো।

বোধ হয় কাল-কেউটে— প্রভাত কপাল কুঁচকে উত্তর দিল।

নয়

আরো দুই দিন এই ভাবে কাটল।

আজ পর্যন্ত প্রভাত আর প্রফুল্ল কোনো লোকালয়ের সন্ধান পায় নি।

কী দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যে তাদের সময় কাটছে তা' আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এই দু'দিন খালি তারা বুনো-কলা আর নালার অপরিষ্কার জল খেয়ে কাটাচ্ছে। এও যে বরাতে জুটেছে— ভাগ্য ভালো বলতে হবে। না হলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাদের যে কি অবস্থা হতো বলা যায় না।

রাইফেলের টোটাগুলিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে,— আর অল্পমাত্র বাকী।

গায়ের জামাকাপড়গুলি ছিন্নভিন্ন, মাথার চুল রুক্ষ শুষ্ক, সারা গায়ে কাদা-মাটি। হঠাৎ কেউ এ ভাবে তাদের দেখলে পাগল ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারবে না।

একটা উঁচু টিলার উপর উঠে প্রভাত দূরের দিকে তাকিয়ে বললে— ছাখো প্রফুল্ল, অনেক দূরে, নদীর মতো কি জানি একটা দেখা যাচ্ছে। চলো, আমরা ঐ দিকে যাই।

প্রভাতের কথায় প্রফুল্ল যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক ঝলক আলো দেখতে পেল। দূরে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলে উঠল— বাস্তবিকই ওটা নদী বলেই বোধ হচ্ছে। শীগ্‌গির চলো,— আমরা নদীর ধারে যাই। নদীতে যদি স্টীমার চলাচল করে তবে আমাদের উদ্ধারের উপায় সহজেই হবে।

প্রভাত বললে— স্টীমার চলুক আর নাই চলুক, দু'একটা নৌকার দেখা হয়তো আমরা পেতে পারি। তারপর একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভাত আবার বললে, কিছুই বলা যায় না প্রফুল্ল, আমাদের যে রকম

জ্বলন্ত-অদৃষ্ট, হয়তো, যেতে যেতে নদীটা মরীচিকার মতো শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

প্রভাত আর প্রফুল্ল এই রকম ভাবে কথাবার্তা বলছে— এমন সময় তাদের পাশের ঘন ঝোপটা হঠাৎ কেঁপে উঠল— আর মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ বিরাট এক লাফ দিয়ে, বিকট এক আর্তনাদ করে নীচের দিকে চলে গেল, তার পিঠে একটা বর্শা বেঁধা।

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে বললে— একি প্রভাত, বাঘটার পিঠে বর্শা বিঁধলো কে ?

প্রভাত উত্তর দিল— নিশ্চয় ধারে-কাছে কোনো শিকারী এসেছে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রফুল্ল চিৎকার করে উঠল— চলো প্রভাত, সেই শিকারীর খোঁজ করি আমরা। নিশ্চয় সে আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে।

চুপ— চুপ প্রফুল্ল— বেশি চিৎকার কোরো না। এই সব পাহাড়ের ধারে ধারে বুনো অসভ্যেরা বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ানক হিংস্র, একটুও দয়ামায়া নেই। অতি নির্মমভাবে ওরা হত্যা করে। শুনেছি মানুষ শিকার করতেও ওরা ভালোবাসে। আমাদের এখন গোপনে জানতে হবে কী প্রকৃতির লোক শিকার করতে এসেছে— এই পর্যন্ত বলেই প্রভাত পিছনে ফিরে একবার তাকাল— যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে মুহূর্তের মধ্যে তার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে যাবার যোগাড়।

অসম্ভব গাঁট্টা-গোট্টা একটা বেঁটে লোক তাকে লক্ষ্য করে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দু-রু-উ-ম— প্রফুল্লের এক গুলিতে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

খুব বাঁচিয়েছ প্রফুল্ল, রাইফেলটা তুলে ধরবার সময় পর্যন্ত আমি পেতাম না, তার আগেই ওর বর্শা এসে আমার শরীরে বিদ্ধ হতো। প্রভাত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

হৈ-হৈ-হো-হো, হোয়া-হোয়া— বিকট চিৎকার করতে করতে কারা

সব ছুটে আসছে।

প্রভাত রুদ্ধশ্বাসে বললে— ঐ ছ্যাখো প্রফুল্ল, ঐ রকম বেঁটে বেঁটে আরো কতগুলি লোক ছুটে আসছে বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে।

চালাব গুলি? প্রফুল্ল বিচলিত কণ্ঠে বললে।

না-না, টোটা আর বেশি নেই আমাদের সঙ্গে,— ওরা দলে অনেক ভারী, ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। এসো তাড়াতাড়ি আমরা পালাই। যখন আর কোনো উপায় থাকবে না তখনই রাইফেল চালাব।

যে দিক থেকে লোকগুলো কোলাহল করতে করতে তেড়ে আসছিল তার বিপরীত দিকে প্রভাত আর প্রফুল্ল প্রাণের দায়ে ছুটতে লাগল।

ঝুপ ঝুপ— ছুটতে ছুটতে প্রভাত আর প্রফুল্ল একটা গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। গর্তের মুখটা ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল তাই তারা দেখতে পায় নি।

গর্তের মধ্যে বন্ধু দুজন এমনিভাবে পড়ে গেছে, অসভ্য লোকগুলি সে খবর জানতে পারল না, তারা বিকট চিৎকার করতে করতে প্রভাত আর প্রফুল্লের খোঁজে অন্যদিকে চলে গেল।

দশ

গর্তের তলায় নরম মাটি, তাই ভিতরে হঠাৎ পড়ে গেলেও চোট বেশী লাগে নি। আচমকা গর্তের ভিতর পড়ে যাওয়াতে প্রথমটা দুজনেই বিশেষ ভড়কে গেছিল।

এ আবার কি হল প্রভাত, সামনে এত বড় গর্ত অথচ আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। অবাক হয়ে প্রফুল্ল বললে।

জানতেই যদি পারবো তবে আর গর্তের মধ্যে পড়তে যাব কেন প্রফুল্ল। যাক এ আমাদের শাপে বর হয়েছে। এই গর্তের মধ্যে হঠাৎ না পড়ে গেলে, ঐ বুনো লোকগুলো হয়তো এতক্ষণ আমাদের ধরে ফেলত। গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রভাত এই কথাগুলো বললে।

গর্তের মুখটা এ রকমভাবে ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা— বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। এ রকম চোরাগর্ত ধারে-কাছে আরও আছে কিনা কে জানে। আমাদের খুব সাবধানে এবার পথ চলতে হবে।

প্রফুল্লর কথা শুনে প্রভাত বললে আমার মনে হচ্ছে— এই গর্ত-গুলি হাতি ধরবার ফাঁদ। দেখছ না কী প্রকাণ্ড চওড়া গর্ত এটা, আর প্রায় কূয়োর মতো গভীর। গর্ত করে উপরে ঘাস পাতা দিয়ে বেমালুম ঢেকে দেওয়া হয়। হাতির পাল তাড়া খেয়ে যখন এ পথ দিয়ে পালাতে যায়, হঠাৎ গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। অনেক সময় বড় বড় বাঘও এই রকম ফাঁদে আটকা পড়ে।

অসভ্য লোকগুলোর গোলমাল আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রফুল্ল বললে— এইবার উঠবার চেষ্টা করতে হবে,— এ রকম গভীর গর্তের থেকে সহজে উঠতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

বাস্তবিকই সমস্যার কথা বটে!

প্রভাত একবার উপরের দিকে তাকিয়ে বললে— কোনো রকমে যদি একবার উপরের গাছের ঐ হেলানো ডালটা ধরতে পারা যায়, তবে কাজটা অনেকটা সোজা হয়ে যায়,— কিন্তু ডালটা ধরি কি করে? প্রফুল্ল তুমি একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও তো, আমি তোমার কাঁধে চড়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।

প্রফুল্লের কাঁধে চড়ে প্রভাত উঁচু দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু এখনো ডালটা অনেকখানি উঁচুতে।

কাঁধের উপর থেকে প্রভাত বললে— দাও তো রাইফেলটা কোনো রকমে আমার হাতে তুলে।

প্রফুল্ল একটা রাইফেল প্রভাতের হাতে তুলে দিল। প্রভাত সেই রাইফেলের সাহায্যে অনেক কষ্টে ডালটাকে নাগালের মধ্যে আনল,— তারপর ডাল ধরে তড়াক করে গর্তের উপর উঠে গেল।

এইবার প্রফুল্লের পালা।

এগারো

উপরে উঠে প্রভাত বড় দেখে একটা গাছের ডাল সংগ্রহ করলো,—তারপর সেটা নামিয়ে দিল গর্তের ভিতর।

উঠে এসো প্রফুল্ল এই গাছের ডালটা ধরে— গর্তের ভিতরে ডালটা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রভাত বললে।

প্রফুল্ল গাছের ডালটা ধরে আস্তে আস্তে গর্তের উপরে উঠতে লাগল।

যেই প্রায় মুখের কাছাকাছি এসেছে— হঠাৎ গেল হাত ফসকে,—আবার ধপাস করে প্রফুল্ল গর্তের ভিতর পড়ে গেল।

এবার ভয়ানক চোট লেগেছে। সে কাতর আর্তনাদ করে গর্তের থেকে বলে উঠল – প্রভাত, প্রভাত, পাঁজরার হাড়ে বড্ড লেগেছে,—আমি আর উঠতে পারছি না।

প্রফুল্লের কাতর স্বর শুনে প্রভাত অস্থির হয়ে উঠল। নীচে নেমে গিয়ে সে যে প্রফুল্লের সেবা করবে তার উপায় নেই; একবার নীচে নামলে, আবার উপরে ওঠা একরকম প্রায় অসম্ভব।

সে উপর থেকে সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠল— প্রফুল্ল, তুমি গর্তের মধ্যে এখন একটু বিশ্রাম করো, আমি ততক্ষণ দেখি তোমাকে উদ্ধার করবার অন্য কোনো উপায় করা যায় কিনা।

প্রভাত একবার চারিধারে তাকালো। দেখতে পেল কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ রয়েছে।

প্রভাত মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে তাকে উৎসাহিত করে বললে—উদ্ধারের উপায় যথেষ্ট আছে, প্রফুল্ল, এই ছাখো সামনে এই শিকড়ের গিঁট দেওয়া দড়ি ঝুলছে। এই গিঁটে গিঁটে পা দিয়ে আমরা অনায়াসে উপরে উঠতে পারবো। এ ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি শরীরে একটু

জোর পেলেই আমরা উপরে যাব।

শরীরে একটু বল ফিরে পেতেই প্রফুল্ল উঠে দাঁড়াল।

প্রভাত বললে তুমি আগে ধীরে ধীরে উপরে ওঠো, তারপর আমি নিজে উঠবার ব্যবস্থা করবো।

ঝুরির দড়ি বেয়ে প্রফুল্ল ক্রমে উপরে উঠে এলো ; প্রভাতও রাইফেল দুটো নিজের পিঠের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে নিয়ে শিকড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

দূর থেকে যে নদীটা অস্পষ্ট একটা ক্ষীণ রেখার মতো দেখাচ্ছিল, প্রভাত আর প্রফুল্ল এখন একবার তাকিয়ে দেখল তারা নদীর অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় শ্রান্ত ক্লান্ত দুই বন্ধু নদীর ধারে এসে শ্যামল ঘাসের উপর পা বাড়িয়ে বসে পড়ল।

এদিকে বিশেষ জঙ্গল নেই। কলকল শব্দে নদীর খরস্রোত ছুটে চলেছে আপন মনে। পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভা সমস্ত নদীটাকে স্বর্ণ-তরল করে তুলেছে।

নদীটা বিশেষ ছোট নয়। এপার আর ওপারের ব্যবধান অনেকখানি।

প্রভাত বসে আছে পা ছড়িয়ে আর তার হাঁটুতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে প্রফুল্ল। প্রভাতের নিবিষ্ট দৃষ্টি নদীর বাঁকের দিকে— যদি দৈবাৎ কোনো নৌকা কি ডিঙ্গি তার চোখে পড়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে,— দূরে নদীর বাঁকটা ক্রমে ছায়া-নিবিড় হয়ে উঠল— আর বেশি দূর দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ ওকি! চাঁদ উঠছে নাকি! কিসের আলোয় নদীর বাঁকটা অপূর্ব জ্যোতিতে ঝলমলিয়ে উঠল ?

প্রভাত সোল্লাসে বলে উঠল— প্রফুল্ল, শীগ্‌গির উঠে পড়ো—

প্রফুল্লের চোখে নেমে এসেছিল সুনিবিড় তন্দ্রা, প্রগাঢ় সুপ্তি। প্রভাতের ঠেলা খেয়ে সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। ঘুমের ঘোর তার তখনো কাটেনি। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে সে প্রলাপের মতো বলে উঠল—

বাঘ! হাতি! বুনোমোষ! সাপ! অসভ্য লোক। গভীর গর্ত!

হাসতে হাসতে প্রভাত বললে— এসব কিছুই নয়, ভালো করে তাকিয়ে ছাখো একটি ষ্টীমার এই দিকে আসছে,— ঐ ছাখো তার সার্চ-লাইটের আলো।

নিমেষের মধ্যে প্রফুল্লের সমস্ত শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রবলে দূর হয়ে গেল। সে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে বললে এঁ্যা, ষ্টীমার !! এসো প্রফুল্ল আমরা শীগ্‌গির টর্চ বাতি জ্বেলে আমাদের বিপদের বার্তা ষ্টীমারের লোকদের ইঙ্গিত করে জানাই।

* * *

ঝক ঝক ঝক ঝক ঝক··

মাল বোঝাই একটি ছোট ষ্টীমার মেঘনা নদী দিয়ে চলেছে চট্টগ্রামের পথে। প্রভাত আর প্রফুল্ল এখন এই ষ্টীমারের আরোহী।

ষ্টীমারে খালাসীরা জন-বিরল নদীর ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ টর্চের আলো দেখে দুই বন্ধুকে উদ্ধার করেছে।

মেঘনার ঘোলা জল ভেদ করে মন্থর গতিতে ষ্টীমার চলেছে আপন ছন্দে আপন খেয়ালে!

ডেকের ধারে দুটি চেয়ার পেতে বসে আছে প্রভাত আর প্রফুল্ল। চট্টগ্রাম থেকে তারা কলকাতায় ফিরে যাবে।

প্রভাত হঠাৎ একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে প্রফুল্লকে বললে— আমাদের অভিযান শেষ হল এইখানেই, এতক্ষণ হয়তো প্রণব আর প্রশান্ত ভারত সীমান্ত পেরিয়ে আফগান রাজ্যে প্রবেশ করেছে।



বৈকুণ্ঠবাবুর পরিচয়

বৈকুণ্ঠবাবুর নাম শুনেছ ?

হয়তো তোমরা শোন নি। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বৈকুণ্ঠ তরফদারের নাম শুনলে আমাদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো।

বাস্তবিকই, এই বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন যেন একটা মূর্তিমান রোমাঞ্চ! তাঁর সঙ্গে আমাদের যে আলাপ হয়েছিল এবং তিনি যে আমাদের খুব স্নেহ করতেন সেই গর্বে এখনো যেন আমাদের বুক উঁচু হয়ে থাকে।

বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন মস্ত একজন,— মস্ত একজন কেন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ একজন শখের শিকারী। অতুল উৎসাহ অদম্য সাহস অদ্ভুত উপস্থিতবুদ্ধি আর অপূর্ব ক্ষিপ্রতা, এতগুলি সদগুণের সমাবেশ ছিল তাঁর ভিতর।

ভারতবর্ষের মতো দুরারোহ পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল তাঁর দুর্জয় সাহসের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল। এমন কি ব্রহ্মদেশীয় দুর্গম স্থানে আর ভারতবর্ষের বিপদসঙ্কুল সীমান্ত প্রদেশেও তিনি অনেকবার ছুটে গিয়েছিলেন দুরন্ত শিকারের নেশায়। জীবনে শিকার করেছিলেন সমস্ত রকমই দুর্দান্ত হিংস্র জানোয়ার, কিন্তু নিরীহ পশুপাখি তাঁর হাতে কখনো মারা গেছে, একথা অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না।

আমরা তখন ছেলেমানুষ, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ। বৈকুণ্ঠবাবু তখন শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর শিকারের গল্পগুলি যেমনি ভয়াবহ তেমনি চাঞ্চল্যকর।

চরম আতঙ্ককর গল্পগুলি নিরাপদে ঘরে বসে শুনতে পরম আনন্দকর। তাই আমরা যখনই তাঁকে দেখতাম তখনই তাঁর কাছে তাঁর অতীত জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনবো বলে আবদার করতাম। তিনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না। সরস, সরল, সুন্দর ভাষায় তিনি তাঁর শিকার কাহিনীগুলি আমাদের বলতেন।

বৈকুণ্ঠবাবু যে সব কাহিনী আমাদেরর বলেছিলেন তারই আজ কয়েকটা সত্যঘটনা এখানে তাঁরই ভাষায় উপন্যাস আকারে বলছি।

গণ্ডারের কাণ্ড

আসামের নিবিড় জঙ্গল।

ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে এসে আমরা আড্ডা গেড়েছি। আমার সঙ্গে একজন বন্ধু আছেন—নাম তাঁর মোহনলাল। মোহনলালও পাকা শিকারী। আমাদের সঙ্গে আরো লোকজন আছে।

প্রথম দিন আমাদের অত্যন্ত নিরাশ হতে হোলো। সারাদিন বনে বনে ঘুরলাম, বড় জন্তু তো দূরের কথা, দু'একটা ছোটখাটো শিকারও চোখে পড়ল না। কি আর করি, মনের দুঃখ মনেই চেপে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

পথে একজন গ্রামবাসী আমাদের খবর দিল যে আজ ভোরেই সে একটি গণ্ডার দেখেছে।

এই শুভ খবরটি পেয়ে আমরা খুবই খুশি হয়ে উঠলাম। প্রশ্ন করে জানলাম যে সে জায়গাটি বেশী দূরে নয়। মাইল দুই দূরে একটা ঘাসের বন আছে, সেইখানে গেলে গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর সময় নষ্ট না করে সেই লোকটিকে পথপ্রদর্শক করে আমরা সদলবলে চললাম গণ্ডারের সন্ধানে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময়ে আমরা গন্তব্যস্থানে এসে হাজির হলাম। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই আমাদের শিকার শেষ করতে হবে।

একদল লোককে পাঠালাম এই ঘাসের বনের তিন দিক ঘিরে নানারকম অদ্ভুত বিকট শব্দ করতে। এই শব্দ শুনে ঘাসের বনের জন্তুগুলো ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তারপর আমরা সুবিধা ও সুযোগ বুঝে গুলি চালাব।

আমাদের আদেশ মতো লোকগুলো বনের তিন দিকে চলে গেল! আমি আর মোহনলাল অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত রইলাম। আমি রইলাম দক্ষিণ দিকে আর মোহনলাল দাঁড়াল একটু দূরে বাম দিক ঘেঁষে।

অল্পক্ষণ পরেই লোকগুলির বিকট চিৎকারে সমস্ত বনভূমি যেন কেঁপে উঠল। আমরা অনুমানে বুঝলাম দলের লোকেরা শিকার দেখতে পেয়েছে।

হঠাৎ সেই ঘন ঘাসের বন ভেদ করে এক বিরাট গণ্ডার-মূর্তি দেখা দিল ও বিদ্যুতের মতো বেগে বাম দিকে তেড়ে এলো ক্রুদ্ধ দানবের মতো। তার পিছনে হৈ-হৈ করে তাড়া করলো দলের লোকজন।

গণ্ডারটা মোহনের দিকে ছুটে যেতেই সে তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে জন্তুটাকে তাগ করে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু উত্তেজনায় তার হাতটা একটু কেঁপে গেল। গম্ভীর গর্জন করে বন্দুকের গুলিটা তার মাথায় না লেগে তার দীর্ঘ তীক্ষ্ণ শিংয়ের এক অংশ উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ বাধা পেয়ে গণ্ডারটা ঘুরে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ যে দিকে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই দিকে ছুটতে শুরু করলো। এই ক্ষিপ্ত জন্তুটার সামনে দলের যে সব লোক পড়ল তারা যে কে কোথায় চোঁচোঁ দৌড় দিল তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই! একজন লোক জন্তুটার প্রকাণ্ড দেহের ধাক্কায় বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল অজ্ঞান হয়ে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গণ্ডারটা তীরবেগে ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে।

আমি আমার সমস্ত শিকারী জীবনের মধ্যে এরকম বদমেজাজী শিকার আর দেখি নি। এই ক্ষ্যাপা জন্তুটার সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে আমিও দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করলাম।

আমি ছুটছি প্রাণপণে, আমার পিছনে তেড়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা। দাঁড়িয়ে যে তাকে গুলি চালাবো এমন অবস্থাও আমার ছিল না। দাঁড়াতে গেলেই জন্তুটা আমার নাগাল পেয়ে যাবে আর তা হলেই, অবস্থা শোচনীয়।

এই ভাবে খানিকটা পথ যেই ছুটে চলেছি হঠাৎ আবার বন্দুকের আওয়াজ কানে এলো। বুঝলাম মোহনলাল পিছন দিক থেকে আবার জানোয়ারটাকে গুলি করেছে।

গুলি খেয়ে গণ্ডারটা একবার থমকে থেমে গেল, তারপর উল্কাবেগে ছুটে চলল পাশের একটা বনের দিকে, মনে হোলো জানোয়ারটা যেন ভীষণ রকম ভয় পেয়েছে।

ছুটন্ত জানোয়ারটা লক্ষ্য করে আমি এবার একটা গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু এতক্ষণ ছুটে আসায় পরিশ্রমে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। তাই গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গভীর বনে জানোয়ারটা বেমালুম আত্ম-গোপন করলো। আমরাও এ যাত্রা গণ্ডারের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

বুনো মোষের আক্রোশ

পার্বত্য ত্রিপুরার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত।...

পাহাড়ের নীচে মালভূমিতে আমাদের এবারকার আস্তানা। এখানে এসে শুনতে পেলাম আমাদের আস্তানা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা শিকারের জায়গা আছে। দেশী লোকেরা খবর দিল, সেখানে নানা জাতীয় শিকার খুবই পাওয়া যায়। বড় বড় বাঘ আর হাতী সেখানে আছে প্রচুর। এখন আমাদের অদৃষ্ট।

দুই দিনের মতো খাদ্য-দ্রব্য ও যথেষ্ট গুলিবারুদ নিয়ে আমরা অত্যন্ত আশা নিয়েই যাত্রা করলাম শিকারের উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, দশ-বারোজন সঙ্গীও সাথে নিতে ভুললাম না।

খুব ভোরে উঠে আমরা যাত্রা করলাম। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে

আমাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না। এসেই আমরা বুঝতে পারলাম— জায়গাটি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুতে পরিপূর্ণ। মোহনলাল অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকটি হরিণ আর একটা সজারু মেরে ফেলল। তুপুরবেলা আমরা খবর পেলাম যে অদূরে একটা জলার ধারে এক পাল বুনো মোষ বিশ্রাম করছে।

এই কথা শুনে মোহনলালের মোষ শিকারের ভয়ানক ইচ্ছা হোলো,— আমারো যে না হোলো তা নয়। অনেক দিন ভালো শিকার চোখে না পড়ায় উৎসাহে যেন সকলেরই ভাটা পড়ে আসছিল। বুনো মোষের খবর পেয়ে আবার যেন আমাদের মনের ভাটায় নূতন করে উৎসাহের জোয়ার এলো।

আমাদের হুকুম মতো দলের লোকজন গিয়ে মোষের পালটিকে ঘেরাও করলো। আগের নির্দেশ মতো তু'জন লোক একটা উঁচু উইয়ের ঢিবির উপর উঠে কাপড় উড়িয়ে সঙ্কেত করলো, এর অর্থ এই যে মোষের পাল এইখানে আছে। সঙ্কেত মতো জায়গায় উপস্থিত হয়ে আমরা জন্তুগুলিকে দেখতে পেলাম। এবার প্রথমে আমিই গুলি ছুঁড়লাম আর আমার অব্যর্থ গুলি খেয়ে একটি মোষ মারা পড়ল। বন্দুকের শব্দে চমকে উঠল মোষের দল, আর দারুণ রকম ভয় পেয়ে তারা যে যেদিকে পারল ছুটতে আরম্ভ করলো।

একটা প্রকাণ্ড মোষ ছুটতে ছুটতে মোহনলালের সামনে আসা মাত্র তার বন্দুকের গুলিতে সেটা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আমাদের দলে শিবু সর্দার বলে একজন অতি সাহসী লোক ছিল। মোষটা আহত হয়ে মাটিতে পড়া মাত্র সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো জন্তুটার কাছে ছুরি দিয়ে তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করবার জন্যে।

মোষটা সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিল বটে কিন্তু মরে নি। শিবু সর্দার তার কাছে যাওয়া মাত্র সে তার সকল শক্তি সঞ্চয় করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর চোখের নিমেষে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিবু সর্দারকে তুই শিংয়ের মধ্যে তুলে ধরে প্রচণ্ড বলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

এমন পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় জন্তুটা একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তাই রক্ষে। শিবু সর্দার তাই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।

আহত জন্তুটা দাঁড়িয়ে কাঁপছিল,— এমন সময় আমার আর মোহন-লালের দুটি গুলি তাকে আবার মাটিতে ফেলে দিল।

রাক্ষুসে সাপের প্রতাপ

গারো পাহাড়ের নীচে বাঘা জঙ্গল। ··

বাঘ শিকারের আশায় আমি আর মোহনলাল উঠে বসেছি একটা বড় গাছের আগডালে। নীচেই খানিকটা জলা জায়গা। খবর পেয়েছি, —এই জায়গাতেই বাঘেরা জল খেতে আসে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে আছি গাছের ডালের উপর। আমার একটু উপরে বসে মোহনলাল। দুজনের হাতেই টোটা ভরা দু'নলা বন্দুক। এখন বাঘ এলে হয়।

হঠাৎ একি হোলো!

চেয়ে দেখলাম গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে মোহন হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে, আর তাকে গাছের উপর থেকে তাড়া করেছে ভয়ঙ্কর বিরাট সাপ। তার ফোঁসফোঁস শব্দে যেন কানে তালা লেগে যায়।

নীচে পড়তে পড়তে মোহন চিৎকার করে বলে উঠল, "যদি বাঁচতে চাও বৈকুণ্ঠ, শীগ্‌গির নীচে নেমে পড়।"

আমি একবার উপর দিকে তাকালাম। ওরে বাস্‌রে বাস, রাক্ষুসে সাপটা মোহনকে ধরতে না পেরে তার লকলকে জিভ বের করে সড়াৎ সড়াৎ করে ডালপালার ভিতর দিয়ে আমারই দিকে তেড়ে আসছে।

আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে এলো। সাপটার চকচকে জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন যাদু মন্ত্রে ছাওয়া,— একবার সেই দিকে তাকালে যেন শরীর আবিষ্টের মতো আড়ষ্ট হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে টোটা-ভরা বন্দুক। কিন্তু আমার কি সাধ্য সেই অস্ত্র

ব্যবহার করি। আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে, মন যেন অবসন্ন হয়ে গেছে। প্রাণহীন জড় স্তূপের মতো আমি ঢিপ করে পড়ে গেলাম গাছের তলে।

কি করে যে আমার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেল তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না।

যাই হোক, দু'দুটো শিকার এইভাবে হাতছাড়া হওয়ায় সাপটার আর রাগের সীমা নেই।

ধকধক করে জ্বলছে তার হিংস্র চোখ দুটো, লক লক করে বের হচ্ছে তার ছুঁচলো জিভ, আর ঝক ঝক করে ইঞ্জিনের মতো শব্দ বের হচ্ছে তার নাক দিয়ে।

মোহন ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে ধুলো ঝেড়ে। আমাকে নীচে পড়তে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল— শীগ্‌গির উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালাও জানোয়ারটার দিকে। ঐ ছাখো ভয়ঙ্কর রেগে কী ভীষণ বেগে ওটা আমাদের দিকে নেমে আসছে। বলতে বলতে মোহন সাপটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল।

আমিও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। আর সময় নষ্ট না করে আমিও চালালাম গুলি।

মোহনের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশের একটা ডালে গিয়ে লাগল। কিন্তু আমার গুলিটা গিয়ে লাগল সাপটার পিছল পিঠের উপর।

আবার চালাও গুলি, মোহন, দেখছ না আমার গুলি খেয়ে সাপটা কি রকম হতভম্ব হয়ে গেছে, হয়তো এক্ষুনি আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। এই বলে আমি আবার যেই গুলি ছুঁড়তে গেছি, হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরে মোহন চাপা-গলায় বলে উঠল— ঐ ছাখো, আমাদের পাশের ঝোপের ধারে—

একটা চিতাবাঘ গুঁড়ি মেরে মেরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে খুব সন্তর্পণে।

এই দৃশ্য দেখা মাত্র আমরা ছুট দিলাম সামনের একটা নলখাগড়া

ঝোপের দিকে, তারপর সেখান থেকে ঝোপ সরিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা আর জীবনে ভুলতে পারবো কিনা সন্দেহ।

তাকিয়ে দেখলাম আমাদের আক্রমণকারী বাঘটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়েছে সেই রাক্ষুসে সাপটা গাছের উপর থেকে। তারপর শুরু হয়েছে তাদের সে কী ভীষণ মল্লযুদ্ধ। বাঘের গর্জনে আর সাপের তর্জনে চারিধারে একটা ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

বাঘ শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে সেদিনের মতো আমরা তাড়াতাড়ি আস্তানার দিকে রওনা হলাম।

কানা শয়তান

কার্তিক মাসের শেষ।....

শীতের আবহাওয়াটা চারিধারে বেশ জমে উঠছে— এই সুন্দরবনে।

সুন্দরবনের নামটা সুন্দর হলেও আসলে একটা ভয়ঙ্কর বাঘের দেশ বলেই বিখ্যাত। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এক রহস্যে ঢাকা সুন্দরবনের অবস্থান।

আজকাল সুন্দরবনে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। কলকাতা থেকে বেশ আরামপ্রদ স্টীমার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা স্টীমারের উপর থেকে বনের অপূর্ব শোভা বেশ ভালো ভাবেই দেখতে পারে। এমন কি বাঘের জলপানের দৃশ্যও অনেক সময়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে উপভোগ করা যায়।

'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ'— বলে একটা প্রবাদ আছে। বাস্তবিক পক্ষে সুন্দরবনেই এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবন প্রায় ৬,৫২৫ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। বাখরগঞ্জ, খুলনা আর ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশই হচ্ছে সুন্দরবন।

ইংরাজেরা এদেশে আসার আগে এই বনের নাম কিন্তু 'সুন্দরবন' ছিল না। এই জঙ্গলে বিস্তর সুন্দরী গাছ জন্মায় বলে,— ইংরাজেরাই এই বনের নাম দিয়েছে 'সুন্দরবন'।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়া কুমির আর হরিণও খুব বেশি দেখা যায়। বুনো মোষও যথেষ্ট আছে। মেঘনা নদীর মোহনার কাছে এই সব বুনো মোষদের আসল আড্ডা। আগে গণ্ডারও ছিল এই জঙ্গলে, আজকাল আর তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

স্থানীয় লোকদের কাছে জানলাম,— এ অঞ্চলে বাঘের উৎপাত খুব বেশি; কুমিরের অত্যাচারও বড় কম নয়। সুন্দরবনবাসীরা সর্বদাই কুমিরের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। বছরে কত যে মানুষ আর গরু ছাগল এই দুর্দান্ত জলজন্তুদের হাতে প্রাণ হারায় তার সীমা সংখ্যা নেই।

শুনলাম, বাগেরহাটের কাছে ঠাকুরদীঘি নামে একটি দীঘিতে সাতটি পোষা কুমির আছে। এই কুমিরগুলির মালিক ছিলেন খান জাহান নামে এক ফকির। ফকির কুমিরগুলিকে ডাক দিলেই তারা ঘাটের সিঁড়ির কাছে এসে জড়ো হোত। ফকির তখন তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে এই দীঘির ধারে মস্ত মেলা বসে।

সুন্দরবনে যে সব হরিণ দেখা যায় তাদের মধ্যে চিতল হরিণই বেশি। আর এক রকম হরিণ আছে তাদের নাম হচ্ছে 'কুকুর-ডাকা হরিণ'। বড়ই অদ্ভুত এই জীবগুলি কুকুরের ডাকের মতো শব্দ করে বলে এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই রকম হরিণ দু' চারটি আমাদের নজরে পড়েছিল কিন্তু মারতে পারি নি। এই হরিণের সংখ্যা আজকাল ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

আগে সুন্দরবনে ভালুক আর চিতাবাঘও দেখা যেত; কিন্তু আজকাল আর বড় একটা নজরে পড়ে না। গোসাপের সংখ্যা এখানে প্রচুর। ১৯২৮ সনে গভর্ণমেণ্ট আইন করে গোসাপ শিকার নিষেধ করে দিয়েছেন।

যদিও সুন্দরবন হচ্ছে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশ,— কিন্তু ক্রমশই এদের সংখ্যাও কমে আসছে। বাখরগঞ্জ এলাকায় বাঘ একেবারে নেই বললেই হয়। লোকজনের বসবাস ও চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ

ক্রমেই সুন্দরবনের পশ্চিম অংশে চলে গেছে।

সুন্দরবনে বাঘ শিকার খুব সহজ আর নিরাপদ নয়। শীতকালই হচ্ছে বাঘ শিকারের উৎকৃষ্ট সময়। একলা বাঘ শিকার একেবারে অসম্ভব। এই সব বাঘ শিকার করতে হলে বেশ দল বেঁধে, সোরগোল করে, স্টীমলঞ্চে কিংবা নৌকায় আসতে হয়।

এক রকম বেদে সম্প্রদায় সুন্দরবনে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। এরা নৌকার উপর কিংবা জলা জমির উপর ছোট ছোট কুটীর তৈরী করে বসবাস করে।

এই সব বেদেরা প্রধানত মাছের ব্যবসা করে। এদের মাছ ধরবার কৌশল ভারী মজার। এদের এক একটি ডিঙ্গিতে ৫।৬টি করে উদ্‌বিড়াল বাঁধা থাকে। মাছ ধরবার সময়ে এই সব উদ্‌বিড়ালেদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা ডুব দিয়ে আর সাঁতার কেটে মাছকে জলের মধ্যে থেকে তাড়িয়ে আনে। এই সময় বেদেরা নৌকার উপর থেকে ছোট ছোট মাছ ফেলে এই উদ্‌বিড়ালদের লোভ দেখায় আর উৎসাহ দেয়।

যাক,— এইবার আসল গল্পটা বলা যাক।

অল্প কয়দিনের মধ্যেই বেশ বড় বড় কয়েকটি বাঘ আমরা ঘায়েল করেছি। চিতাবাঘও যে কয়টা না মারা গেছে— তাও নয়। তবে চিতা বাঘের মতো ছোট শিকারে আমার মন ওঠে না।

হঠাৎ একদিন স্থানীর বেদের কাছে শুনলাম, একটা কানা বাঘের জুলুমের কথা। বাঘটা জাঁদরেল গোছের, সাধারণত এত বড় বাঘ নাকি এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় না। জন্তুটার এক চোখ কানা। এটার নাম এ অঞ্চলে কানা শয়তান। স্থানীয় লোকেরা বলে— এক অপদেবতা নাকি এই বাঘের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, আর লোকজনের অনিষ্ট করে। একে কাবু করা নাকি অসম্ভব। হাওয়ার মতো এসে নাকি জন্তুটা গ্রামের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। শুনে, মনে মনে স্থির করে ফেললাম, একবার এই 'কানা শয়তানের' সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। মোহনকে মনের ইচ্ছাটা জানালাম। সে বলল, 'চেষ্টা করে

দেখতে পার, তবে কাজটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।'

দিন কয়েক পরে সন্ধ্যার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একজন গ্রামবাসী এসে খবর দিল, এইমাত্র 'কানা শয়তান' এসে তার একটা গরু নিয়ে পালিয়েছে।

খবরটা পেয়ে আমি মোহনকে নিয়ে তক্ষুণি রওনা হলাম তাদের গ্রামে। গ্রামবাসীরা বললে, এই সামনের জঙ্গলের মধ্যেই হয়তো 'কানা শয়তান' গরুটার সদ্ব্যবহার করেছে। তবে তাকে ঘায়েল করা নাকি এক রকম অসম্ভব।

মোহনকে নিয়ে আমি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। সঙ্গে আমাদের টোটা-ভরা রাইফেল আর টর্চ বাতি।

এক জায়গায় মনে হোলো যেন 'কানা শয়তান' কড়মড় করে গরুর হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে। আমরা পা টিপে টিপে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লোক যেন কালো কম্বল গায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। 'লোকটির তো ভয়ানক সাহস দেখছি' আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম। মোহন টুক করে টর্চের আলো লোকটার উপর ফেলতেই আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। প্রকাণ্ড এক ভালুক দুই হাত তুলে আমাদের দিকে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। ভালুক, টাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। সেই সঙ্গে শুনলাম বিকট এক প্রাণ-কাঁপানো বাঘের গর্জন। আমার গুলির ঘায়ে ভালুকটা টলে পড়ল বটে কিন্তু ভালুক মারতে গিয়ে আমরা এ যাত্রা কানা শয়তানকে হারালাম।

এক ঢিলে দুই পাখি

পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের শেষে শুরু হয়েছে বিখ্যাত লুসাই পাহাড়ের শ্রেণী। এবার আমার সঙ্গে মোহনলাল নেই। আছেন বন-বিভাগের একজন কর্মচারী—মিঃ রায়। তিনিও একজন পাকা শিকারী।

কয়েকদিন থেকে একটা ভয়ঙ্কর মানুষ-খেকো বাঘ এসে আশে পাশের গ্রামে ভয়ানক উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। সেই বাঘের খোঁজে চলেছি আমি আর মিঃ রায়। যে করেই হোক তাকে ঘায়েল করা চাই।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে হাজির হলাম একটা পাহাড়ী জায়গায়। হঠাৎ মিঃ রায় বলে উঠলেন, ঐ দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু, মস্ত একটা হাতী পাহাড়ের উপর থেকে ঝড়ের মতো বেগে নেমে আসছে আমাদের দিকে শুঁড় তুলে।

সর্বনাশ, তাকিয়ে দেখলাম একটা হাতী নয়, তার পিছনে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে নেমে আসছে ছোট বড় অসংখ্য হাতী।

মিঃ রায় বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আসুন বৈকুণ্ঠবাবু; আমরা চটপট সামনের ঐ গাছটায় উঠে আত্মরক্ষা করি। রাইফেলের গুলিতে আমরা এতগুলি হাতীর বিশেষ কিছুই করতে পারবো না, শুধু ক্ষেপিয়ে তুলবো মাত্র। আসুন, আসুন, গাছটায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি।

মিঃ রায় গাছে উঠতে বললেন বটে, কিন্তু কাজের সময়ে দেখলাম গাছটাতে ওঠা সহজ কথা নয়। নীচে ডালপালা এমন কিছু নেই যা ধ'রে গাছে ওঠা যায়। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছিল, তাতে গাছটা হয়েছে ভীষণ রকম পিছল। মিঃ রায় খানিকটা উঠে আবার হড়কে পড়ে গেলেন নীচে।

ওদিকে হাতীর পাল প্রায় এসে পড়েছে।

আমি বলে উঠলাম— আর উপায় নেই মিঃ রায়। যে রকম দেখছি, তাতে গাছে ওঠা অসম্ভব। চলুন তাড়াতাড়ি ঐ পাথরগুলির আড়ালে,— ঐখান থেকে আমরা তাগ ক'রে ওদের গুলি চালাই,— এ ছাড়া বাঁচবার আর অন্য কোনো উপায় দেখছি না।

ছুটতে ছুটতে আমরা পাথরগুলির পাশে একটা সুবিধা মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

হাতীর পাল নীচে নেমে এসেছে। সামনের সেই বিশাল হাতীটা

হেলতে দুলতে কিছু দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর শুঁড়ে তুলে তার কুৎকুতে চোখ তুলে আমাদের একবার ভালো করে দেখে নিল, তারপর বিকট একবার গর্জন করে তেড়ে এলো— আমাদের দিকে। তার পিছনে ছুটে আসতে লাগল সেই মস্ত হাতীর পাল।

আমরা আর উপায় না দেখে গুলি চালালাম। আমাদের অব্যর্থ হাতের সন্ধানে রাইফেলের গুলি ছুটে গিয়ে লাগল প্রথম হাতীটার কপালে। আচম্বিতে আহত হয়ে হাতীটা মুখ ঘুরিয়ে একবার মাটিতে বসে পড়ল। তারপর আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ভীমগর্জনে প্রচণ্ড বেগে আমাদের আক্রমণ করলো। পিছনে হাতীর পাল থমকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তারা আর এগোতে ভরসা করলো না।

এর ভিতর আমরা আবার রাইফেলে গুলি ভরে নিয়েছি।

আহত ক্ষিপ্ত হাতীটা প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার ভয়ঙ্করভাবে তেড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আমরা যেই আবার গুলি চালাতে যাব এমন সময়ে ঘটল এক আজব ব্যাপার।

পাশের এক ঝোপ থেকে অতর্কিতে প্রকাণ্ড এক বাঘ ভীষণ রকম লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আহত হাতীটার ঘাড়ের উপর।

এই দৃশ্য দেখে পিছনের হাতীর পাল গাছপালা ভেঙে হুড়মুড় করতে করতে যে-যেদিকে পারলো, ছুটতে লাগল। বাঘে হাতীতে লেগে গেল তুমুল যুদ্ধ। আমরা এই সুযোগে একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে পর পর গুলি চালাতে লাগলাম জানোয়ার দুটিকে লক্ষ্য করে।

হাতীটা আগে থেকেই কাবু হয়েছিল। আহত হাতীটার দু'চার ঘা লাথি খেয়ে বাঘটার অবস্থাও হয়ে পড়েছিল কাহিল। তার উপরে আমাদের রাইফেলের গুলির আঘাত তারা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলো না।

মিঃ রায় হাতীটাকে লক্ষ্য ক'রে ক্রমাগত গুলি চালাচ্ছিলেন! আমার লক্ষ্য ছিল বাঘটার উপর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর জন্তু দুটোকে আমরা ঘায়েল করে ফেললাম।

তারপর থেকে গ্রামে আর মানুষ-খেকো বাঘের উৎপাত হয় নি। এই বাঘটাই যে সেই মানুষ-খেকো তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি নি।

আচ্ছা বিপদ

বর্মার শান রাজ্য।...

উত্তর বর্মার শান রাজ্যে আছে সব বড় বড় পাহাড় আর ভয়ঙ্কর সব জঙ্গল। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এখানে সরকারী কর্মচারী।

আমার শিকারের বাতিকের কথা শুনে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে বসল। আমিও আর কোনো রকম আপত্তি না করে একদিন সোজা এসে হাজির হলাম তার আস্তানায়।

বন্ধুটির নাম সরোজ। বনজঙ্গলের জরিপের কাজের ভার তার উপর। খাসা জায়গায় তার আস্তানা— অর্থাৎ সর্বদা প্রাণটি হাতে নিয়ে এখানে বাস করতে হয়। শিকারীদের কাছে এর চেয়ে লোভনীয় জায়গা আর কি থাকতে পারে। বন্ধুর কাছে শুনলাম, বাঘ নাকি সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়! বাঘের খোঁজে জঙ্গলে অনর্থক হয়রাণ হতে হয় না—, বাঘ নিজেই এসে দেখা দেয়।

কথাটা শুনে বাস্তবিকই আনন্দ আর উৎসাহে আমার মন ভরে উঠল। এতদিন বাঘ মারতে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে,— কত নাকালই না জানি হয়েছি। এবার মনের সাধে বাঘ মেরে হাতের সুখ করতে হবে।

বিকেলবেলা চায়ের টেবিলে বসে সরোজের সঙ্গে শিকারের গল্প হচ্ছিল। সরোজ কথায় কথায় বললে— এ দেশে ডাঙায় যেমন বাঘের অত্যাচার, জলে আবার তেমনি কুমিরের উৎপাত। ছোটখাটো খালেও এদের উপদ্রব বড় কম নয়। এদেশের এক একটা কুমির ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের পাল্লায় পড়লে আর কারো রক্ষা নেই। বাঘ

বাবাজীরাও অনেক সময়ে জল খেতে এসে কুমিরের হাতে খায়েল হয়।

সরীসৃপ অর্থাৎ যে প্রাণী বুকে হেঁটে চলে তাদের মধ্যে কুমীরই হচ্ছে সকলের চেয়ে আকারে বড় আর বলবান। সুন্দরবন অঞ্চলে আমি কয়েকটি বড় বড় কুমির শিকার করেছিলাম। ২০ ফুট না হলেও, সেগুলির আকার বড় কম ছিল না।

আজ পর্যন্ত কুড়ি রকমের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কোনও জাতের কুমির আকারে ৫।৬ ফুটের বেশি হয় না। সব কুমিরই খুব ধীরে ধীরে আকারে বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বড় জাতের কুমির যেগুলি সেগুলিও অনেক বছর ধরে' খুব আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। হঠাৎ এরা কেউই দু'চার দিনে বেড়ে ওঠে না।

কুমিরের ডিমগুলি দেখতে বাস্তবিক পক্ষে একটা হাঁসের ডিমের চেয়ে বেশি বড় নয়। এক সঙ্গে একটা কুমির অনেকগুলি ডিম পাড়ে। নদীর কিনারায় ঝোপ-ঝাড় কিংবা শুকনো লতাপাতার গাদার মধ্যে কুমির এসে ডিম পেড়ে যায়। এই ডিম ফুটে ছানা বেরুতে লাগে প্রায় দুই মাস। এই দুই মাস কাল কুমির তার ডিমগুলির উপর সব সময়েই খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাছে কেউ এসে ডিমগুলি খেয়ে ফেলে বা নষ্ট করে ফেলে। সবচেয়ে ভয়, তার ডিমগুলির যে বাবা তার উপর, কারণ মদ্দা কুমিরগুলো একটু সুযোগ পেলেই এসে ডিমগুলি টপাটপ সাবাড় করে ফেলে।

ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয়, তখন তারা আকারে ৮।১০ ইঞ্চির বেশি হয় না। বাচ্চা বেরুবার পর কুমির-মায়ের কর্তব্য প্রায় এক রকম ফুরিয়ে যায়। বাচ্চাদের তখন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হয়।

বাচ্চাগুলো খাবার খুঁজতে খুঁজতে নদীতে এসে নামে, আর পোকা-মাকড় ও ছোট ছোট মাছ ধরে ধরে খেতে শুরু করে। তারা যদি প্রথম থেকেই প্রচুর খাদ্য পায়, তা হলে অতি শীঘ্রই তারা বেড়ে ওঠে।

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই কুমিরের আধিপত্য বেশি। শীতের

দেশে নদী-নালায় কুমির খুবই কম দেখা যায়। একদম নেই বললেই হয়। শীত এরা সহ্য করতে পারে না। এই কারণে শীতের দেশের যে সব চিড়িয়াখানায় কুমির রাখা হয়— তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। এমন ঘরে তাদের রাখা হয়— সেখানে দিনে রাতে সব সময়েই গরম জলের নল কিংবা বিদ্যুতের প্রবাহ দিয়ে গরম রাখা হয়।

কুমিরের চারিটি পা। এই পাগুলি খুব মজবুত আর কার্যকরী নয় বলে বেশির ভাগ সময়েই তাকে জলের মধ্যে থাকতে হয়। কুমিরের চ্যাটালো লেজ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই জিনিসটি তাকে সাঁতার কাটতে খুবই সাহায্য করে। মাছের মতো অতি স্বচ্ছন্দেই কুমির নদীতে সাঁতার কাটতে পারে ইচ্ছামতো। শিকার ধরবার সময়ে কুমির তার সমস্ত শরীরটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে কেবল চোখ দুটি আর নাকের ডগাটি বাইরে বের করে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে। কোনো জন্তু কি মানুষ নদীতে জল খেতে এলে, সে অতি ধীরে ধীরে ঐভাবে আত্মগোপন করে তার শিকারের দিকে এমন ভাবে এগুতে থাকে যে, কার সাধ্য টের পায় যে কুমির শিকার ধরতে চলেছে। তারপর হঠাৎ শিকারের সামনে উপস্থিত হয়েই সে প্রবল বেগে শিকারের ঠ্যাং ধরে তাকে গভীর জলে নিয়ে যায়।

ভারতবর্ষে, মালয় আর অস্ট্রেলিয়াতেই সব চেয়ে বড় জাতের কুমির দেখা যায়। অনেক সময়ে সমুদ্রের কাছাকাছি নদীতে ৩০।৩৫ ফুট লম্বা কুমিরও দেখা গেছে। আফ্রিকার কুমিরও অতি সাংঘাতিক। নীল নদীতে যে সব কুমির দেখা যায় তারাও আকারে কম নয়।

উত্তর আমেরিকার এক রকম কুমির দেখা যায়,— এরা আকারে বেশি বড় হয় না, আর এদের স্বভাবও অন্য জাতের কুমিরের মত রুক্ষ নয়। এরা সহজেই পোষ মানে, আর পালনকারীর কথা শোনে। এদের চামড়ায় সুন্দর সুন্দর ব্যাগ আর জুতো তৈরি হয়।

সবচেয়ে সুন্দর কুমির বাস করে পশ্চিম আফ্রিকায়। এরা আকারে ছয় ফুটের বেশি হয় না। এদের রং বাদামী, দেহের গঠনটিও চমৎকার।

সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এদের শান্ত স্নিগ্ধ চোখ দুটি। এদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে,— এরা বহুরূপীর মতো রং বদলাতে পারে।

তোমরা কেউ কুমিরের ডাক শুনেছ! বাস্তবিকই কুমির তার গলা দিয়ে এক রকম আওয়াজ বের করে— দূর থেকে শুনলে মনে হয় যেন ঘেঁউ ঘেঁউ করে কোনো জানোয়ার ডাকছে।

কুমির সম্বন্ধে এই রকম নানা রকম আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। সরোজকে বললাম, আগে বাঘের তৃষ্ণা মিটাই তার-পর কুমিরের দিকে নজর দেওয়া যাবে। দেশে ফিরবার সময়ে দু'চারটে বড় বড় কুমির শিকার করে যাব।

সরোজের তাঁবু পড়েছে একটা পাহাড়ের ধারে। জরিপের কাজ সেরে আস্তানায় ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়ে যাওয়ায় এই জায়গাতেই তাঁবু ফেলা হয়েছে। ভোর বেলা আস্তানায় ফিরতে হবে। সরোজের সঙ্গে আমি ছাড়া আছে আর কয়েকটি স্থানীয় লোক। সরোজের সঙ্গে আমি বেরিয়েছিলাম জায়গাটার সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচিত হবার জন্যে।

রাত গভীর। আমরা সবাই তাঁবুর ভিতর ঘুমে অচেতন, হঠাৎ কিসের যেন একটা আওয়াজে আমার ঘুম গেল ভেঙে। চমকে উঠে তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলাম, তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে— বাঘের একটা প্রকাণ্ড মুণ্ড।

এক ধাক্কা দিয়ে ঘুমন্ত সরোজকে তুলে বললাম, সরোজ, সরোজ— বা-ঘ। আমাদের সাড়া পেয়ে বাঘটা আবার তার মুণ্ডুটা তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেল।

আমি দলের লোকদের জাগালাম। মহাসুযোগ উপস্থিত, যে করেই হোক এই জানোয়ারটাকে ঘায়েল করতেই হবে।

সরোজ বললে, এখন বাঘটাকে আর ঘাটিয়ে দরকার নেই। রাতটা কাটুক ভোরবেলা না হয় দেখা যাবে।

আমি কিন্তু নাছোড়-বান্দা। বললাম, সকালের আশায় থাকলে, বাঘটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই মহাসুযোগ কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়।

দলের লোকগুলি সবাই জেগে উঠে বসেছে। হঠাৎ তারা চীৎকার করে উঠল। সর্বনাশ, তাকিয়ে দেখলাম তাঁবুর একটা ফাঁক দিয়ে বাঘমশাই তার প্রায় অর্ধেকটা শরীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে,— আর মুখ দিয়ে 'গরগর' আওয়াজ করছে।

সরোজ বললে— শীগ্‌গির তাঁবুর বাইরে চল আগে, নইলে বাঘের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত। বন্দুক চালাবার আগেই ও আমাদের কারুকে খতম করবে।

আমাদের দলের লোকগুলি বাঘটাকে তাঁবুর ভিতরে ঢুকতে দেখে, টকাটক বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। সরোজও আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে চলে এলো। বাঘটা ততক্ষণ তার সমস্ত শরীরটা তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবার হোলো মহা মুশকিলের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুতে গিয়ে অস্ত্রগুলি সবই তাঁবুর ভিতর ফেলে এসেছি। দলের লোকগুলিও একেবারে অস্ত্রহীন।

সরোজ বললে— বাঘটা যখন তাঁবুর ভিতর ঢুকেছে, ওটাকে আর বের হতে দেওয়া হবে না। বের হয়ে এলেই মহাবিপদের কথা হবে।

রাত্রি গভীর হলেও, আকাশে ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তাই চারিধারের দৃশ্য আমাদের বেশ স্পষ্ট ভাবেই নজরে পড়েছিল। বাঘটা তাঁবুর ভিতর গিয়ে যে ছুটপাট শুরু করে দিয়েছে,— বাইরে থেকে সেটা আমরা বেশ টের পাচ্ছি।

সরোজ দলের লোকদের হুকুম দিল 'চটপট তাঁবুর দড়িগুলি খুলে তাঁবুসুদ্ধ বাঘটাকে চাপা দাও। এ ছাড়া এখন আর আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই।

দলের লোকগুলি ছিল খুবই সাহসী আর বলিষ্ঠ। তারা সরোজের কথা মতো তাঁবুর চারিধারের দড়িগুলি খুলে ফেলতেই হুড়মুড় করে ভারী তাঁবুটা সশব্দে বাঘটার উপর পড়ে গেল।

আর যায় কোথায়! তাঁবুটা পড়বামাত্র, বন্দী বাঘের যে কী ভয়ানক গর্জন আর ছটফটানি! কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ একদম বন্ধ।

যতই সে বাইরে বেরুতে চেষ্টা করে ততই জড়িয়ে পড়ে তাঁবুর সঙ্গে।

সরোজের আদেশ মতো লোকগুলি কতগুলি বড় বড় গাছের ডাল যোগাড় করে আনল— তারপর বিপুল উৎসাহে হৈ-হৈ করতে করতে বাঘটাকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করলো। আমরাও যে দু' এক ঘা না দিলাম তা নয়। রাত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘেরও দফা শেষ হয়ে গেল।

রহস্যময় ভালুক

বন্ধু জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ভালুক সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। সম্প্রতি হাজারি-বাগের জঙ্গল থেকে এক ভালুক এসে গভীর রাতে শহরের মধ্যে ভারী-উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। দুই একটি লোককে ঘায়েল করেছে, অথচ আজ পর্যন্ত কেউ এই জন্তুটাকে কাবু করতে পারে নি। কখন কোন্ সময়ে যে শহরে ঢোকে, আর নিজের কাজ সেরে বেমালুম অন্ধকারে গা' ঢাকা দেয়, কেউ তা ঠাহর করতে পারে না। এই ভালুকটার জন্যে সবাই তটস্থ।

বন্ধু জ্যোতির্ময় পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তার বাড়িতে এসে আমি অতিথি হয়েছি এক রকম হঠাৎই বলতে হবে। এসেই শুনলাম এই ভালুকটার উৎপাতের কথা।

পূর্বে আর কখনো ভালুক শিকার করি নি। এই জন্তুটা যে শিকার করবার জন্য এমন একটা বিশেষ কোনো বস্তু আমার কখনই মনে হয় নি। ভালুক শিকার আর শেয়াল শিকার একই রকম মনে করতাম।

সাধারণত যে সব ভালুক আমাদের চোখে পড়ে তার রং হচ্ছে ঘোর কালো। আবার অনেক রকমের ভালুক আছে। কারো রং ধূসর, কারো রং বাদামী,— আবার মেরুদেশে যে সব ভালুক বাস করে তাদের রং ধবধবে সাদা। ভালুককে দেখতে খুব 'ভালোমানুষ' বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু এই জীবটিকে বিশ্বাস করতে নেই একটুও। কারণ তার মেজাজের ঠিক নেই।

জ্যোতির্ময় বলে— চিড়িয়াখানায় অনেক সময় দেখা যায় ভালুক ভায়া মুখখানা কাচুমাচু করে অতি নিরীহ গোবেচারীর মতো খাঁচায় গরাদের ফাঁক দিয়ে তার হাতখানা বের করে দর্শকদের ডাকছে। সর্বনাশ, বিশ্বাস করে তার নাগালের মধ্যে গেলেই হয়েছে আর কি! একটি থাবা মেরে তোমাকে সে কাবু করে ফেলবে। মোট কথা, ভালুক অতি বিশ্বাসঘাতক জীব। তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

আগে ভালুক শিকার না করলেও, এই জীবটির স্বভাব-চরিত্রটি আমি বেশ ভালো করেই জানতাম। জ্যোতির্ময়ের কথার উত্তর দিলাম আমি, শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়, এই জানোয়ারটির মগজটি দুষ্টুবুদ্ধিতে একেবারে ঠাসা। অনেক সময়ে সে তাঁর রক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়ে। একবার পালিয়ে গেলে তাকে ধরে' আনা খুবই কঠিন ব্যাপার।

যা বলেছো বৈকুণ্ঠ,— চুরুট টানতে টানতে জ্যোতির্ময় বলে, জীব-জগতে এই রকম বুদ্ধিমান জীব আর দুটি পাওয়া ভার। গভীর চিন্তা করে এরা কোনো কাজে হাত দেয়। বোকার মতো যা' তা করে বসে না। বুদ্ধি খুব প্রখর বলে ভালুককে পোষ মানাতেও বেশী হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। একটা কুকুরকে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দিতে যে সময় লাগে তার অনেক কম সময় লাগে একটা ভালুককে শিক্ষা দিতে।

জ্যোতির্ময়ের ছোট ভাগ্নে অমলেন্দু আমাদের পাশে বসে ভালুকের গল্প শুনছিল। সে এবার প্রশ্ন করলো— মামা, ভালুক কি খায়?

উত্তর দিলাম আমি, বললাম— ভালুকের খাওয়া-দাওয়াতে কোনো রকম বাছাবাছি নেই। মুলো, গাজর, কপি, ঘাস, ফল, রুটি, ভাত, মাংস যা পায় তাই তৃপ্তির সহিত খায়। তাই ভালুক পুষতে তাকে খাওয়াবার জন্য মালিককে বেশি চিন্তা করতে হয় না।

জ্যোতির্ময় বললে— বুনো অবস্থায় ভালুক সাধারণতঃ ফল-মূল, ঘাসলতা আর পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে। আবার সুযোগ ও সুবিধা পেলে সে ছাগল ও ভেড়া আক্রমণ করে ভূরি ভোজন করতেও

ছাড়ে না। শীতকালে সাধারণত ভালুক ঘুমিয়েই দিন কাটায়। কাজেই শীত আসার আগে সে পেট ঠেসে খাওয়ার আয়োজন করে। সেই খাওয়াতেই যে চর্বি তার শরীরে জমে সেই চর্বিই সমস্ত শীতকালটা তার শরীরকে সুস্থ রাখে। আবার গরম পড়তে আরম্ভ করলেই সে খাবার সংগ্রহে মন দেয়।

অমলেন্দু এবার বললে— ভালুক মহুয়া খেতে খুব ভালোবাসে বলে শুনেছি। শহরে যে ভালুকটা এসে উৎপাত শুরু করেছে— আমার মনে হয় মহুয়ার লোভেই সে শহরে এসে প্রবেশ করে।

উত্তর দিল জ্যোতির্ময়— হাঁ, হাঁ, মিষ্টি জিনিসের উপরই ভালুকের লোভ। মহুয়া খেতে বেশী মিষ্টি বলে ভালুক মহুয়া খুবই পছন্দ করে। মৌচাকের উপর তার ভয়ানক ঝোঁক। সর্বদাই সে কান খাড়া করে ঘোরে মৌমাছির ডাকার শব্দ শুনবার জন্য। মৌমাছির সাড়া পেলেই তার মনটা স্ফূর্তিতে ভরে ওঠে— কারণ সে বুঝতে পারে কাছেই কোথাও মৌচাক আছে। মৌচাক চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। যত উঁচুতেই থাক্ না কেন ভালুক গাছে চড়তে ওস্তাদ। মৌমাছির কামড়কে সে পরোয়া করে না।

অমলেন্দু প্রশ্ন করলো,— কেন মামা, মৌমাছির কামড়ে ভালুকরা ব্যথা পায় না বুঝি!

জ্যোতির্ময় বললে— ভালুকের লোমশ শরীরে মৌমাছিরা কিছুতেই হুল ফুটাতে পারে না। গাছে চড়ে আরাম করে ভালুক মৌচাক নিংড়ে খায়। মৌমাছিরা বেশি চালাকি করতে আসলে সে টপাটপ মৌমাছি ধরে ধরে মুখে পোরে।

আমি বললাম— অনেক সময়ে ভারী মজা হয়। টেলিগ্রাফের তারের যে সব খুঁটি থাকে, ভালুক তাতে কান পেতে বোঁ বোঁ শব্দ শুনে ভাবে বুঝি মৌমাছি উড়ছে। সে তাড়াতাড়ি সেই খোঁটা বেয়ে মৌচাকের লোভে উপরে ওঠে আর টেলিগ্রাফের তার নষ্ট করে।

গল্প করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। বললাম, জ্যোতির্ময়,

ভাড়াবাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারার ব্যবস্থা করো। আজ রাত্রেই তোমাদের রহস্যময় ভালুকটার সঙ্গে একবার ভালো করে বোঝাপড়া করতে হবে। একটা সামান্য ভালুক যদি না মারতে পারি তবে আমার শিকারী জীবনই বৃথা।

জ্যোতির্ময় হেসে বললে,— চেষ্টা করে একবার দেখ বৈকুণ্ঠ। আমরা তো সবাই হার মেনে গেছি, এবার বৈকুণ্ঠ শিকারীর হাতযশটা দেখা যাক্। জানোয়ারটাকে ঘায়েল করতে পারলে বাস্তবিকই জনসাধারণের একটা পরম উপকার হবে। বাস্‌রে, সন্ধ্যার পর থেকেই শহরবাসীদের যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর জ্যোতির্ময় বেরিয়ে পড়লাম ভালুক শিকারের উদ্দেশ্যে।

শীতের শেষ। আরামপ্রদ মলয় হাওয়ার স্পর্শে শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না রাত, পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো একটা তিথি।

আমাদের দু'জনের হাতেই দু'খানা আধুনিক ধরনের বন্দুক। জ্যোতির্ময়ও শিকারে খুব ওস্তাদ না হলেও একেবারে কাঁচা নয়। পাখি মারতে খুবই পটু সে। বিশেষত তার চেহারাটা চোখে পড়লে পাড়ার কাকের দল নিমিষের মধ্যে কোথায় যে গা ঢাকা দেয় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। উড়ন্ত সারস কিংবা বকের ঝাঁক তার চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই।

শহরের প্রান্তে মাঠের মাঝে মহুয়া বন,—তারপরই শুরু হয়েছে শালবনের গভীর জঙ্গল। মহুয়া গাছে এন্তার মহুয়া ফলেছে, গাছের তলাতেও অসংখ্য মহুয়ার রাশ। টুপটাপ করে অনবরত মহুয়া ঝরছে।

জ্যোতির্ময় বললে— এই জায়গাটাই হচ্ছে ভালুকের আসল লক্ষ্য-স্থল। এই বনেই ব্যাটা মহুয়া খেতে প্রথমে ঢোকে, তারপর শহরে প্রবেশ করে। এসো আমরা এইখানেই কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করি।

আমারও বিশ্বাস তাই। জ্যোৎস্নার আলোতে তাকিয়ে দেখলাম,

কিছু দূরেই একটা ডোবা চাঁদের আলোতে ঝিল্‌মিল্‌ করছে।

আলবত। ব্যাটা ধারেকাছেই কোথাও আস্তানা গেড়ে আছে, এক সঙ্গে ফলাহার আর জলপান দুই-ই এই জায়গায় হয়। কাজেই— বলতে বলতে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম, তারপর চাপা গলায় বললাম, ঐ শোনো জ্যোতি, মরাপাতার উপর খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জ্যোতির্ময়কে ইশারা করে একটা বড় মহুয়া গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছের তলায় পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে,— যেন আলো-ছায়ার আলপনা। দু'জনেরই স্থির দৃষ্টি সেই দূরাগত আওয়াজের দিকে। দূরে আবছার মতো কি জানি একটা জীব হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে।

'দু রু-উ-ম'—

জ্যোতির্ময়ের আর তর সইল না, জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করে চালালো গুলি। ভালুক মারার বাহাদুরিটা সে একলাই নেবে,— কাজেই সে আমার আগেই জন্তুটাকে তাগ করলো।

অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্যই হোক, আর আন্দাজেই হোক, জানোয়ারটা বাস্তবিকই ঘায়েল হোলো জ্যোতির্ময়ের হাতে। বেশ দেখলাম জন্তুটা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হুর্‌রে— জ্যোতির্ময়ের আনন্দ যেন শত ধারায় উছলে উঠল। একছুটে চলে গেল সে আহত ভালুকটার দিকে। আমিও চললাম তার পিছনে পিছনে।

জন্তুটা একটা কাঁটাঝোপের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

জ্যোতির্ময়ের সমস্ত উৎসাহ যেন জীবটার কাছে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আমিও ততক্ষণ কাছে গিয়ে পড়েছি। বলে উঠলাম, করলে কি জ্যোতি, বেচারী নিরীহ খেঁকশিয়ালটাকে মেরে ফেললে!

জ্যোতির্ময় রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, অতদূর থেকে কি ছাই জানোয়ার চেনা যায়।

উৎসাহ দিয়ে আমি বললাম— কুচ্‌ পরোয়া নেই, চলো এবার খাদ্য

শিকারের সন্ধানে। খেঁকশিয়ালটার নেহাৎ আজ আয়ু ফুরিয়েছিল বলেই এমন বে-মক্কা মারা পড়ল। তুমি তো উপলক্ষ্য মাত্র।

মহুয়া বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল একটি ভাঙা কুঁড়েঘর।

এসো হে জ্যোতি এই ঘরটার মধ্যেই ঘাঁটি আগলানো যাক। এখান থেকেই আমরা শিকারের উপর নজর রাখি। অনর্থক ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই।— আমি প্রস্তাব করলাম। জ্যোতির্ময় আর আমি এসে যেই কুঁড়েটার মধ্যে ঢুকতে গেছি অমনি দু'জনেই হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ শুনে। ওরে বাবা, ভালুক নাকি!

না, ভালুক নয়, আমরা ঘরে ঢুকতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বেরিয়ে গেল একটা শুয়োর। অন্ধকারে ভালুক ভেবে আমরা চমকেই উঠেছিলাম। জ্যোতির্ময় তো তার বন্দুকখানা চালিয়েছিল আর কি!

জ্যোতির্ময়ের ভালুক মারবার মারাত্মক রকম শখ আর উৎসাহ দেখে আমি বললাম, ভাই জ্যোতি, ভালুক তুমিই মেরো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো মাত্র। ষোল আনা বাহাদুরি তোমারি হবে যদি সত্যই ভালুকটা মারতে পারো। কিন্তু অনর্থক খেঁকশিয়াল বা শুয়োর মেরে গুলি নষ্ট করো না।

রাত গভীর হয়ে চলেছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে চাঁদ,— এলোমেলো বাতাস বইছে মাঝে মাঝে। আমরা চুপচাপ বসে আছি শিকারের আশায়। কিন্তু এতক্ষণ বসাই শুধু সার। জ্যোতির্ময় পুলিশের লোক হলেও অন্তরটা তার ভাবে ভরপুর। সে চীৎকার করে' গান শুরু করলো।

—এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান—

বাধা দিয়ে আমি বললাম, থামো জ্যোতি, তোমার গানের সাড়া পেলে শিকারের যেটুকু আশা আছে সেটুকুও বরবাদ হয়ে যাবে। গানটা অবিশ্যি আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু তারও স্থান আর কাল আছে।

ভাঙা পোড়ো বাড়ী। উপরের চালের অর্ধেকটা নাই। একদিকের দেয়ালটা গেছে ধ্বসে। সেই ভাঙা দেওয়ালটার ফাঁক দিয়ে দূরের ডোবাটা আমাদের বেশ নজরে পড়ছে।

— ঐ ছ্যাখো বৈকুণ্ঠ, এইবার আর ভালুক না হয়ে যায় না—।

জ্যোতির্ময়ের কথা শুনে আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যই কালো মতো একটা জীব ডোবার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ হল। ভালুক চতুষ্পদ জীব, কিন্তু ও রকম সোজা হয়ে হাঁটছে কেন ?

জ্যোতির্ময় বললে,— তুমি জানো না বৈকুণ্ঠ, অনেক সময়ে ভালুকেরা তুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটে। এমন সুযোগ ছাড়া কিছুতেই উচিত নয়! দেখছো না কি রকম কালো রং জানোয়ারটার। ও ভালুক না হয়েই যায় না।—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলো জ্যোতির্ময়ের বন্দুক। দূর কম নয়, তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল জ্যোতির্ময়ের গুলি। জন্তুটার পাশ কাটিয়ে শোঁ করে টোটা বেরিয়ে গেল,— আর অমনি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ এসে পৌঁছলো আমাদের কানে। আরে এ যে মানুষের স্বর। তবে কি এটা ভালুক নয়। ভাগ্যিস গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

তু'জনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেলাম তার কাছে। গিয়ে দেখি একজন বুড়ো সাঁওতাল কালো চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে! বন্দুকের শব্দে তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

* * *

ভোর হবার আর বেশী দেরী নেই। পূর্ব আকাশের কোলে রঙের আবেশ ফুটে উঠেছে। আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। এসে শুনলাম গত রাত্রে সেই ভয়ঙ্কর ভালুকটা শহরে এসে আরো তুটি লোককে জখম করেছে।

ভুটানের জঙ্গলে

বড় রকম শিকারের লোভে ভুটানের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেললাম। সঙ্গে সাকরেদ মোহনলাল।

আস্তানায় ফেরবার পথ খুঁজতে খুঁজতে বেলা হল অনেক কিন্তু পথের সন্ধান আর পাওয়া গেল না। তার উপর শুরু হল আবার দারুণ রকম দুর্যোগ। যেমনি ঝড়, তেমনি বৃষ্টি।

'গুড়্-গুড়্ গুরুম্'—

কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। উঃ বাপরে, কি আতঙ্ককর আওয়াজ।

— বাপরে বাপ্, বাজের শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার মতো,—

মোহনলাল আরো কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি বলে উঠলাম— ঐ ছাখো মোহন, কী বিরাট এক মোষ বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে শিং নেড়ে। সাবধান মোহন, রাইফেলটা ঠিক করে বাগিয়ে ধরো,— মোষটা বোধহয় হঠাৎ বাজের শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে আমাদের দিকে আসছে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহন সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল, আর রক্ষা নেই বৈকুণ্ঠ,— একটা নয়, দুটো নয়, ঐ ছাখো ওর পিছনে তেড়ে আসছে হাজার হাজার বুনো মোষ। দুর্দান্ত ক্ষ্যাপা জানোয়ারের দল।

এসো এক কাজ করা যাক মোহন, তাড়াতাড়ি এই সামনের বট গাছটায় উঠে পড়ি এসো। আমরা দুজনে যত বড় শিকারীই হই না কেন, এতগুলো ক্ষ্যাপা জন্তুর সঙ্গে আমরা কিছুতেই পেরে উঠবো না। গুলি চালিয়েও ওদের ভয় দেখানো যাবে না। ঐ যে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে। আর দেরী করো না। এই বলেই আমি তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে গেলাম।

গাছে তো উঠতে গেলাম, কিন্তু পায়ে ভারী বুটজুতো থাকাতে অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। গাছের ডালগুলিও ছিল অনেক উপরে। খানিকটা উপরে উঠে আবার পিছলে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

ওদিকে মোষের পাল ভীষণ গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে প্রায় এসে পড়েছে আমাদের কাছাকাছি।

আর রক্ষা নেই মোহন, এই দুর্যোগের মধ্যে এখন ছুটে পালানোও অসম্ভব, গাছেও সহজে ওঠা যাবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ সামনের ঘন নল-খাগড়ার ঝোপটার আড়ালে গিয়ে লুকোনো! শীগ্‌গির চল, ঐ ঝোপটার আড়ালে গিয়ে ওদের লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ি।— এ ছাড়া আর কোনোও পথ আপাতত দেখতে পাচ্ছি না।

এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলতে বলতে আমি ছুটে চললাম সেই ঘন ঝোপটার দিকে। মোহনলালও আমার পিছনে ছুটে চলল।

সামনের সেই ধাড়ী মোষটা প্রবল বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর শিং তুলে তার লাল-লাল চোখ দুটো মেলে কী একটু ভেবে নিয়ে পরমুহূর্তেই তেড়ে এলো মোহনলালের দিকে।

ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে পিছল পাহাড়ী পথ। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ মোহনলাল চিৎকার করে উঠল— বৈকুণ্ঠ, গেলাম, গেলাম, আমি পা হড়কে মাটিতে পড়ে গেছি।

আমি আগে আগে ছুটে চলেছিলাম, হঠাৎ মোহনলালের চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালাম। যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে যেন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে এলো। মোহনলাল মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে, দূরে ছিটকে পড়েছে তার রাইফেলটা,— আর সামনের দিক থেকে তেড়ে আসছে সেই বিরাট ক্ষ্যাপা মোষটা বিদ্যুৎবেগে।

পরিণাম কল্পনা করে আমার মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে উঠল, পরমুহূর্তেই আমি নিজেকে সামলে নিলাম। শেষ চেষ্টা করে একবার দেখতে হবে মোহনলালকে বাঁচানো যায় কি না। স্থির হয়ে দাঁড়ালাম,

রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়লাম মোষটার মাথা লক্ষ্য করে।

প্রবল বেগে মোষটা ছুটে আসছিল, হঠাৎ মাথায় গুলি লাগায়, সে থমকে দাঁড়াল। আবার ছুটে চলল আমার রাইফেলে টোটা। এবার গিয়ে লাগল তার একটা চোখে। দস্তুর মতো ঘাবড়ে গিয়ে মোষটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করতে করতে গভীর বনে গা' ঢাকা দিল।

যাক্, মস্ত ফাঁড়া কাটল মোহনলালের। এক দৌড়ে এসে তাকে হাত ধ'রে টেনে তুলে বললাম। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোহন, তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারব বলে আশা করতে পারিনি।

মোহনলালের শরীরে বেশ ঝাঁকানি লেগেছিল, হাত-পা অনেকখানি ছিড়ে গেছিল। ছট্‌কে-পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে সে বললে— এই বিপদ থেকে যে রক্ষা পাব মোটেই আশা করতে পারি নি বৈকুণ্ঠ। আজ নেহাৎ বরাত জোরে রক্ষা পেলাম। ভাগ্যিস্ তুমি ঠিক সময়ে মোষটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলে। আমি হয়তো ভয়েই দিশাহারা হয়ে যেতাম।

আমি বললাম, বড় রকম একটা ফাঁড়া আজ কাটলো ভাই তোমার, চল তাড়াতাড়ি এই ভয়াবহ জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করি। আকাশের অবস্থাও বিশেষ সুবিধা বলে মনে হচ্ছে না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মোহনলাল— যে রকম প্রবল বাতাস চলেছে, তাতে মনে হয় শীগ্‌গিরই মেঘ কেটে যাবে। বৃষ্টিটা অনেকটা কমে এসেছে। বলতে বলতে পাশের ঝোপের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মোহনলাল বলে উঠল, ওরে বাপরে ; ঐ ছাখো বৈকুণ্ঠ পাশের ঝোপটার আড়ালে।

তাকিয়ে দেখলাম, আর একটা প্রকাণ্ড বুনো মোষ, ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে তার ধারালো শিং দুটো আন্দোলন করছে,— ঐ যে— ঐ যে— তেড়ে আসছে এবার আমাদের দিকে।

গুলি চালাবারও আর সময় নেই। দুজনে প্রাণের দায়ে ছুট দিলাম বিপরীত দিকে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পড়লাম গভীর একটা গর্তের

মধ্যে। গর্তের তলার মাটি ছিল বেশ নরম, তাই চোট লাগল না আমাদের। শুধু আচমকা গর্তে পড়ে যাওয়াতে প্রথমে দুজনেই বিশেষ ভড়কে গেলাম।

মোষের হাত থেকে রক্ষা পেলাম বটে ; কিন্তু এ যে আর এক নূতন বিপদের মধ্যে এসে পড়লাম। গর্তের মুখটা এরকম ভাবে ঘাস-পাতা দিয়ে ঢাকা— বড়ই আশ্চর্য মনে হোলো। মোহনলালকে বললাম, এ নিশ্চয় হাতী ধরবার চোরাগর্ত, হাতী ধরবার ফাঁদ দেখছো না কি প্রকাণ্ড চওড়া গর্ত। প্রায় কূয়োর মত গভীর। গর্ত করে উপরে ঘাস-পাতা দিয়ে বেমালুম ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

এই গর্ত থেকে উদ্ধার পাবার কি উপায় ভাই বৈকুণ্ঠ ! মোহনলালের গলায় নিরাশার সুর।

আমি একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম গাছের একটা ডাল হেলে এসে গর্তের মুখের কাছে পড়েছে। বললাম, কোনো রকমে যদি একবার উপরের গাছের ঐ হেলানো ডালটা ধরতে পারা যায়, তবে উদ্ধারের একটা উপায় হয়। কিন্তু গর্তটা এত গভীর যে ডালটা ধরা সহজ কথা নয়। মোহন, তুমি একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও দেখি, আমি তোমার কাঁধে চড়ে ডালটা ধরতে একবার চেষ্টা করি।

মোহনলাল সোজা হয়ে দাঁড়াল, আমি তার কাঁধে উঠে উপর দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু ডালটা অনেক উঁচুতে। মোহনলালকে একটা রাইফেল আমার হাতে তুলে দিতে বললাম। মোহন আমার কথা মতো একখানা রাইফেল আমার হাতে তুলে দিল।

সেই লম্বা রাইফেলটার সাহায্যে আমি অনেক চেষ্টা করে ডালটা ধরে ফেললাম তারপর কোনো রকমে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

উপরে উঠে বড় দেখে একটা গাছের ডাল সংগ্রহ করে তারপর সেটা নামিয়ে দিলাম গর্তের মধ্যে। মোহনলাল সেই ডালটা ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো। যাক বাবা, এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে, হাওয়ার জোরও গেছে অনেকটা কমে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের মুখ দেখা গেল। সূর্য তখন পশ্চিম দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে।

এখন কোন্ দিকে যাবে বৈকুণ্ঠ, সন্ধ্যা হবার যে বেশী আর বাকী নেই,— পথের কিনারা ত কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না।

মোহনলালের কথা শুনে আমি উত্তর দিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই আমাদের কোনোও নিরাপদ জায়গায় যাবার দরকার। দিনের বেলাতেই প্রাণটি হাতে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে, রাত্রি হলে তো তার কথাই নেই। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি চুপ করলাম তারপর মোহনলালকে বললাম, ঐ শোনো মোহন, ঢব্ ঢব্ করে মধ্যে মধ্যে যেন ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কান খাড়া করে সেই দূরাগত শব্দটা শুনে মোহনলাল উল্লাসিত হয়ে বলে উঠল, ঢাকের আওয়াজই বটে, নিশ্চয়ই তা হলে কাছে লোকালয় আছে। দাঁড়াও, একটা উঁচু গাছে উঠে আমি দেখছি।

এই বলে মোহনলাল বিপুল উৎসাহে তরতর করে একটা উঁচু গাছের আগডালে উঠে পড়ল, তারপর চারিধারে তাকিয়ে সোল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠল, কিছু দূরেই একটা মঠের মতো কি জানি দেখা যাচ্ছে বৈকুণ্ঠ, ঐ যে হলদে পোশাক পরা কয়েকজন লোককে দেখতে পাচ্ছি। এইবার একটা কিনারা পাওয়া গেল।

মোহনলালের কথা শুনে আমারও উৎসাহ ফিরে এসেছে, বললাম, তাড়াতাড়ি নেমে এসো মোহনলাল, সন্ধ্যা হবার আর বেশী দেরী নেই।

বাস্তবিকই কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বৌদ্ধমঠে হাজির হলাম। মঠের সন্ন্যাসীরা আমাদের বিপদের কথা বুঝতে পেরে আমাদের আশ্রয় দিল। সে রাত্রি আমরা মঠেই কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন ভোরবেলা সন্ন্যাসীদের সাহায্যে আমরা শহরে ফিরে এলাম।

অসভ্যদের কবলে

কথায় বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' ; শিকারের লোভে কতবারই যে মৃত্যুর মুখে পড়ে অতি আশ্চর্য অদ্ভুতভাবে বেঁচে এসেছি তার আর হিসাব-নিকাশ নেই। নেহাৎ আয়ুর জোর ছিল তাই অপমৃত্যু ঘটতে ঘটতেও ঘটে নি, মৃত্যু-দূতের সামনা-সামনি পড়েও ভাগ্য বলে পাশ কাটিয়ে এসেছি। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন সব সময়েই আমাকে আড়ালে আড়ালে রক্ষা করে গেছে। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থায় পড়েছিলাম আমরা একবার ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তের জঙ্গলে পথ হারিয়ে।— সঙ্গে ছিল সেবার মোহনলাল।

বড় বাঘ শিকারের আশায় নদীর তীরের আস্তানা ছেড়ে আমরা সেই যে সকালে এসে জঙ্গলে প্রবেশ করেছি,— আর বাইরে বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না,— সূর্য প্রায় মাথার উপর।

সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর নির্ভর করে আর কতক্ষণ পথ চলা যায়। যেদিকে যাওয়া যায় সেই দিকেই গভীর জঙ্গল। কিছুক্ষণ আগে একটা মেঠোপথ পাওয়া গেছিল— সেটাও ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ও পথ দিয়ে আর এগুনো অসম্ভব। এলোপাথাড়ি পথ চলতে চলতে আমরা বিলকুল হাঁপিয়ে উঠেছি,— আর যেন পা চলে না।

সামনেই একটা উঁচু ঢিলা। সেখানে কয়েকটা পাথরের ঢিবি দেখতে পেয়ে মোহনলাল টপ করে একটার উপর বসে পড়ে বলল— আর যে পারা যায় না বৈকুণ্ঠ ; হেঁটে হেঁটে পা দুটো যেন অচল হয়ে গেছে, আর কতক্ষণ এভাবে যে আমাদের উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পথ চলতে হবে ভগবানই জানেন, ধারেকাছে কোথাও লোকালয়ের সন্ধান পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি তো সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছি।

মোহনলালের কথার দিকে আমার বিশেষ মন ছিল না। দূর থেকে

ভেসে আসা একটা শব্দ আমি অতি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। মোহনলাল আসতেই আমি প্রশ্ন করলাম— কিছু শুনতে পাচ্ছ ভাই মোহনলাল, ভালো করে লক্ষ্য করে শোন তো!

আমার কথা শুনে মোহনলাল কান খাড়া করে সেই শব্দটা শুনে বলে উঠল, ওঃ, এই শব্দের কথা তুমি বলছো, ঝড়— এ ঝড়ের শব্দ। শুনছো না গাছের পাতায় পাতায় ঝরঝর থরথর শব্দ জাগছে।

উঁহু— মৃদু হেসে আমি উত্তর দিলাম— ধরতে পারলে না ভাই মোহনলাল শব্দটা কিসের! ঝড় হলে কি আর আমরা টের পেতাম না। দেখছো না এদিকে ঝড়ের কোনোই লক্ষণ নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। দেখছ না কেমন ফুরফুরে বাতাস বইছে।

তাও'তো বটে! দূরে ঝড় উঠলেও তার আভাস আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। অন্তত বাতাসের একটা পরিবর্তন হতো অবশ্যই। মোহন-লাল বললে।

আমি বললাম— আমার ধারণা, কাছেই বোধ হয় কোনো ঝরনা আছে। পাহাড় থেকে খুব জোরে নীচে জল ঝরে পড়ছে তারই শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা। চল মোহন, ঐ শব্দটা অনুসরণ করে আমরা এবার পথ চলতে থাকি। জলের ধারে লোকালয় থাকা অসম্ভব নয়।

লোকালয়ের কথা শুনে মোহনলালের প্রাণটা যেন আশায় ভরে উঠল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে যেন এক ঝলক আলো দেখতে পেল। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে,— আর দেরী নয় বৈকুণ্ঠ, ঐ শব্দ অনুসরণ করে চল আমরা হাঁটতে থাকি। ঝরনার ধারে যদি সত্যিই কোনো গ্রামের সন্ধান পাই তা হলে অনেকটা আশার কথা।

আমরা এই রকম ধরনের আলোচনা করছি হঠাৎ একটা বিদ্‌ঘুটে বিশ্রী শব্দ আমাদের কানে এলো। মনে হলো কেউ যেন আমাদের এই দুর্দশা দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

শব্দটা শুনে আমরা প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। জনমানবহীন এই গভীর জঙ্গলে এই রকম বিটকেল হাসি হাসে কে!

আমরা তাকিয়ে দেখলাম পাশের একটা উঁচু গাছের ডালে বসে এক অদ্ভুত জানোয়ার আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে হাসছে। জন্তুটার চেহারাটা অনেকটা অর্কট বানরের মতো!

রোসো বাপধন, বের করছি তোমার দাঁত খিচুনি। আমরা মরছি দিশেহারা হয়ে ঘুরে ঘুরে এই বিদ্‌ঘুটে জঙ্গলে আর উনি দিব্যি বসে আমাদের ভেংচি কাটছেন। ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি! কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোহনলালের বন্দুক থেকে সশব্দে গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল জন্তুটার দিকে।

আজব কাণ্ড অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় গেল সেই জানোয়ারটা! ভীষণ আওয়াজে মোহনলালের গুলি গিয়ে লাগল সেই ফাঁকা ডালটাতে। কতগুলি অদ্ভুত ধরনের পাখী কিচকিচ করতে করতে উড়ে চলে গেল দারুণ ভয় পেয়ে।

আরে এ যে তাজ্জব ব্যাপার মোহনলাল, হতচ্ছাড়া অর্কটটা গেল কোথায়? ব্যাটাচ্ছেলে শেষে কিনা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়ল! আমি বলে উঠলাম বিস্ময়ের সুরে।

সর্বনাশ বৈকুণ্ঠ! আমরা আর একটা বিপদের সামনে পড়ে গেছি। আমার গুলিটা গিয়ে লেগেছে বোধ হয় একটা ভীমরুলের চাকে। ঐ চেয়ে দেখ, ঝাঁকে ঝাঁকে সব বিষাক্ত ভীমরুল তাড়া করে আসছে আমাদের দিকে।

মোহনলালের কথায় আমি তাকিয়ে দেখলাম আমাদের সামনের দিকের আকাশ প্রায় অন্ধকার করে তেড়ে আসছে বিষাক্ত ভীমরুলের ঝাঁক। তাদের ডানায় গুনগুন শব্দে জেগে উঠেছে যেন হাজার হাজার বীণার সম্মিলিত ঝঙ্কার!

আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয় ভেবে আমি আর মোহনলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম সেই ঝরনার শব্দ লক্ষ্য করে। পিছনে শোনা যেতে লাগল লক্ষ লক্ষ ভীমরুলের বিষাক্ত ঝঙ্কার।

ছুটতে ছুটতে আমরা এসে হাজির হলাম একটা ছোট নালার ধারে।

সেই বিষাক্ত ভীমরুলগুলি অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ করেছিল, অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। ভীমরুলগুলি আকারে যেমনি ভয়ঙ্কর তাদের গুঞ্জনও তেমনি আতঙ্ককর।

নালার ধারে হুপ করে বসে পড়ে মোহনলাল বললে,— একটু না জিরিয়ে পারছি না বৈকুণ্ঠ, হাঁপানির চোটে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

মোহনলালের কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার নজরে এমন একটি দৃশ্য পড়ল যাতে থরথর করে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। দেখলাম গাছের আড়াল দিয়ে একটা কদাকার কুৎসিত লোক বল্লম তুলে আমাদের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। বল্লমটা যে কোনও মুহূর্তে আমাদের দিকে ছুঁড়তে পারে ভেবে আমি আর কিছু মাত্র দেরী না করে চালালাম গুলি তাকে তাগ করে। আমার অব্যর্থ হাতের সন্ধানে লোকটা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মোহনলাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললে— উঃ মস্ত একটা ফাঁড়া কাটলো বৈকুণ্ঠ, ভাগ্যিস ঠিক সময়ে তোমার নজরে পড়েছিল। নইলে অসভ্য লোকটার ঐ বিষমাখানো বল্লম এতক্ষণে আমাদের ভবের খেলা সাঙ্গ করে দিত।

আর এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মোহন। আমার ধারণা আমরা নিশ্চয়ই কোনো অসভ্য বর্বরদের আস্তানার কাছে এসে পড়েছি। একটা অসভ্যের দেখা যখন পেয়েছি তখন নিশ্চয়ই ধারেকাছে এদের বস্তি বা গ্রাম আছে। তারা যদি কোনরকমে টের পায় এই লোকটা আমাদেরই হাতে মারা পড়েছে, তা হলে ওরা এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। সে প্রতিশোধ যে কি রকম অমানুষিক নৃশংস তা কল্পনা করা যায় না।

আমার কথা শুনে মোহনলালের চোখে মুখে একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠল। সে বললে,— এসো এক কাজ করা যাক, লোকটাকে আমরা ধরাধরি করে এই নালার জলে ভাসিয়ে দেই।

আমি বললাম— নালার জলে মৃতদেহটাকে ভাসিয়ে দিলেও আমরা

নিরাপদ হবো না। আমাদের বন্দুকের শব্দ নিশ্চয়ই অন্যান্য অসভ্যেরা শুনতে পেয়েছে। কাজেই চটপট এইস্থান ত্যাগ করা আমাদের দরকার।

আমরা এইভাবে আলোচনা করছি হঠাৎ কানে এলো মানুষের গলার শব্দ। বিশেষ লক্ষ্য করে আমরা শুনলাম অনেক দূরে কয়েকটি মানুষ যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আর এখানে দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে আমরা তাড়াতাড়ি মৃতদেহটাকে নালার ধারে ফেলে ছুট লাগালাম।

নালাটার একধারে ঘন ঘাসের ঝোপ। ঘাসগুলো প্রায় দেড়-দুই মানুষ উঁচু। আত্মরক্ষা করার জন্যে আমরা এসে সেই ঘাসের ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলাম। আর ঝোপের ঘাস সরিয়ে লোকগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

দেখলাম, সেই অসভ্য লোকগুলো মৃতদেহটাকে ঘিরে বসে আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে,—আর একজন বুড়ো লোক মৃতদেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে চীৎকার করছে, মিয়াঙ্গু, মিয়াঙ্গু, ইয়া-হা-হা—

অনুমানে বুঝলাম, মৃত লোকটার নাম মিয়াঙ্গু।

দলে প্রায় কুড়ি, পঁচিশ জন লোক হবে।

দলের একজন বলিষ্ঠ লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অদ্ভুত ভাষায় চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাকী লোকগুলি দাঁড়িয়ে উঠে তাদের হাতের বল্লমগুলো মাটিতে সশব্দে ঠুকে গর্জে উঠল অবোধ্য বুনোভাষায়। তাদের প্রত্যেকের মুখেই প্রবল উত্তেজনার ভাব।

বুড়ো লোকটা এতক্ষণ মিয়াঙ্গুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। বোধ হয় সে মিয়াঙ্গুর বাবা। এইবার সে উঠল তারপর কোলে করে ছেলের মৃতদেহটাকে বয়ে এনে নালার জলে ভাসিয়ে দিল।

ওরে বাসরে বাস,— কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার,— এই ছোট নালার জলে যে এত কুমীর আসতে পারে তা তো আমাদের ধারণারই বাহিরে।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম— নালার জলে মৃতদেহটা পড়ামাত্র সমস্ত

নালার জল আন্দোলিত করে শত শত কুমিরের মুখ জেগে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে মিয়াঙ্গুর মৃতদেহটা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল,— তা আর টের পাওয়া গেল না। আবার নালার জল পূর্বের মতোই শান্ত ভাব ধারণ করলো। দলের লোকগুলি যে খুবই খাপ্পা হয়ে উঠেছে— সে বিষয়ে আর কোনোও সন্দেহের কারণ নেই।

একবার হত্যাকারীদের সামনে পেলে তাদের যে কি অবস্থা হবে,— তা যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই বেশ অনুমান করতে পারে।

সবচেয়ে বলিষ্ঠ লোকটাই বোধ হয় দলপতি। মৃতদেহটাকে নালার জলে ভাসিয়ে দিয়ে,— সে আবার গর্জে উঠল বাঘের মতো। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই স্বর প্রতিধ্বনিত হোলো দলের অন্যান্য লোকদের গলায়। সকলের সমবেত গলার আওয়াজে সমস্ত বনটা যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। ভয়ে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে; থরথর করে হাঁটু কাঁপছে বুক ছুর ছুর করছে। কোনো রকমে যদি আমাদের খোঁজ পায় তা হলে আর রক্ষা নেই। যদিও আমাদের হাতে গুলিভরা বন্দুক আছে,— তবুও ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো কি না সন্দেহ, কারণ দলে ওরা অনেক বেশী।

আমরা যে জায়গায় আত্মগোপন করে ছিলাম, অসভ্যগুলোর কাছ থেকে আমাদের এই গুপ্তস্থানের ব্যবধান খুব বেশী নয়,— কয়েক হাত মাত্র তফাৎ। আমি ইশারা করে মোহনলালকে 'টুঁ' শব্দটি করতে মানা করলাম।

দলপতি একবার ভালো করে চারিধারে তাকাল,— তার যেন সন্দেহ হয়েছে যে আততায়ীরা নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে, কিংবা এখনো পালিয়ে বেশী দূরে কোথাও যেতে পারে নি।

গাছের উপরই তাদের লক্ষ্য বিশেষ করে। আশেপাশে যত ঝোপড়া গাছপালা, তারা সেগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। দুই একজন সর্দারের ইঙ্গিতে গাছের উপর চড়েও দেখল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হোল তাদের। ফিসফিস করে মোহনলাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল,

আমি তৎক্ষণাৎ তার মুখ চেপে তাকে কোনো রকম শব্দ করতে বারণ করলাম।

সর্দার এইবার একবার ঝোপটার দিকে লক্ষ্য করলো। ভয়ে আমাদের প্রাণ উঠল কেঁপে। সর্বনাশ, এই ঝোপের ভিতর খোঁজ করলেই হয়েছে আর কি।

ঐ দেখ বৈকুণ্ঠ, সর্দার এক পা এক পা করে আমাদের ঝোপের দিকে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করেছে আমাদের। ঐ দেখ বল্লম বাগিয়ে ধরেছে,— এক্ষুণি বোধ হয় ঝোপটা লক্ষ্য করে—

মোহনলালের কথা শেষ হতে না হতে আমি ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলাম —আর দেরী কোরো না মোহনলাল, যা থাকুক বরাতে, চালাও গুলি সর্দারের মাথা লক্ষ্য করে।— বলতে বলতেই আমার অব্যর্থ হাতের গুলি ছুটে গিয়ে সশব্দে সর্দারের কপালে বিদ্ধ হলো, বল্লম চালাবার আগেই সর্দার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটির উপর!

ভীমরুলের চাকে যেন ঢিল পড়ল। সর্দার এই রকম আকস্মিক ভাবে মাটিতে পড়া মাত্র দলের মধ্যে শুরু হল ভীষণ রকম হৈ-চৈ। প্রথমে তারা যেন হতভম্বই হয়ে গেল, তারপর সকলে মিলে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল পাশের ঝোপটার দিকে।

—ডুরুম ডু-উ-ম ডু-উ-ম—

উপর উপর তিন-চারটা গুলি খেয়ে দলের আরো তিন চারজন লোক মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে দলের অন্যান্য লোক যেন ভীষণ রকম ভয় পেয়ে গেল। তারা আর না এগিয়ে এইবার পিছন ফিরে ছুটতে লাগল আর্তনাদ করতে করতে।

ঈস্, আজ মস্ত বড় এক ফাঁড়া কাটলো মোহনলাল— ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আমি বললাম।

মোহনলালের এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছে। বললে, ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট গুলি ছিল, নইলে হয়েছিল আর কি।

আহত লোকগুলির মধ্যে দুই একজন তখনও গোঙাচ্ছিল। সর্দার পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে, তার আর প্রাণের কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যারা পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে তাদেরও ভবের মেয়াদ আর বেশীক্ষণ নেই।

এইবার এইখান হতে পালাই চল মোহনলাল। শত্রুপুরী যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। আমার মনে হয়, যে লোকগুলি পালিয়েছে তারা আরো লোক জড়ো করে আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এই দুর্বৃত্ত অসভ্যের দল যে আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে না।

আমারও তাই ধারণা বৈকুণ্ঠ, এখানে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঐ দেখুন সামনে তাকিয়ে—

তাকিয়ে দেখলাম কিছু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আড়ালে একটা বড় বাঘ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

বাঘ মারার মতো আর মনের বা শরীরের অবস্থা ছিল না। যে শিকারের লোভে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলাম, সেই শিকার আজ স্বয়ং সামনে উপস্থিত। কিন্তু মনের অবস্থা এখন অন্য রকম। কোনো রকমে পালাতে পারলে এখন যেন বাঁচি। আমি মোহনলালকে বললাম—বাঘটা নিশ্চয়ই এই মৃতদেহগুলিকে সৎকার করতে আসছে। চল এইবার সটকে পড়ি এখান থেকে। বাঘের কিন্তু মৃত জিনিসের চেয়ে জীবন্ত জিনিসের উপরই লোভ বেশী।

হালু-উ-ম—

বাঘের বিকট গর্জন কানে আসা মাত্র আমরা নালা ধরে ছুটতে লাগলাম উর্দ্ধশ্বাসে।

বরাত ভালোই বলতে হবে। সন্ধ্যার অনেক আগেই আমরা এসে হাজির হলাম একটা চা-বাগানের ধারে। সেখানে এক সাহেবের কুঠীতে আশ্রয় পাওয়া গেল। রাত্রিটা সেই কুঠীতেই কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম।
